স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৬ষ্ঠ বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১৬-জানুয়ারি ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ,
গোপাল সরকার,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

আমার বাচ্চা কিছু খায় না

আজকালকার সব মায়েরই একই অভিযোগ। বাচ্চারা কি হঠাৎ করে সবাই বিগড়ে গেল? কিচ্ছু না খেয়েও তারা দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে, বড়ো হয়। পড়ে-লেখে, চাকরি করে—কেমন করে যে করে, সেও এক রহস্য! সে রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন **ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে।** ৪

সদ্যোজাত শিশুর গা হলুদ

সবে জন্মানো শিশুর জন্ডিস কেন হয়? কী করে বুঝবেন শিশুর জন্ডিস হয়েছে? কোন জন্ডিস স্বাভাবিক আর কোনটাই-বা রোগ, রোগ হলে কী করবেন? বিশদে জানাচ্ছেন **ডা. মানস কুমার মহাপাত্র** ৮

স্যালাইনের ব্যবহার ও অপব্যবহার

স্যালাইন দেওয়ার রকমফের, স্যালাইন-এর ব্যবহার, অপব্যবহার, অপব্যবহারে ফল মারাত্মক হতে পারে, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত—এইসব দরকারি আলোচনা শেষে স্যালাইনও যে একটা ওষুধ—এই কথাটা মনে রাখতে বলেছেন **ডা. মৃন্ময়** ২২

চিনি, হৃদ্‌রোগ ও গবেষণার ওপর বৃহৎ শিল্পের প্রভাব

চিনি খাওয়ার ফলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে। এটাকে গোপন করতে আর স্যাচুরেটেড চর্বিকে হৃদ্‌রোগের ভিলেন বলে খাড়া করতে আমেরিকার বৃহৎ পুঁজির চিনিশিল্প ৫০ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে আর গবেষণাকে করেছে পক্ষপাতদুষ্ট। একাজে দেদার ডলার ছড়িয়েছে তারা, আর বহু বছর বিজ্ঞান-গবেষণার ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই কাহিনি জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রকাশিত নিবন্ধে ফাঁস হয়েছে। ৪৫

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
আমার বাচ্চা কিছু খায় না	ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে	৪
সদ্যোজাত শিশুর গা হলুদ	ডা. মানস কুমার মহাপাত্র	৮
পেটে জল জমা বা অ্যাসাইটিস	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	১১
প্রাথমিক শুশ্রূষা	ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই	১৩
শীতকালে ত্বকের সমস্যা	ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	১৬
জলাতঙ্কে আতঙ্ক নয়	সৌম্য সেনগুপ্ত	১৭
স্যালাইনের ব্যবহার ও অপব্যবহার	ডা. মৃন্ময়	২২
কুসুমবাই ও সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন	২৬
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	২৭
মেনোপজে মনখারাপ	মধুছন্দা দত্ত	৩১
পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম	ডা. কাঞ্চন মুখার্জি	৩২
খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে জি আই ও জি এল-এর যোগ কোথায়?	ডা. নীলাদ্রি শেখর মিত্র	৩৫
নিষিদ্ধ ডায়াবেটিসের ওষুধ	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৩৮
টুকরো খবর		
ক্যালশিয়াম বড়ি আপনার হার্টের ক্ষতি করতে পারে		৩৭
জাপানি বিজ্ঞানী ইশিনোরি ওসুমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন		৩৯
মানুষের আয়ুর শেষ সীমা কি ১১৫ বছর?		৪০
ক্ষুধাসূচকের তালিকায় ভারতের অবস্থান খারাপ		৪১
ভারতের তিন বৃহৎ হত্যাকারী: হার্ট অ্যাটাক, ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের রোগ, স্ট্রোক		৪২
মাথা যন্ত্রণা কি হবেই	ডা. সুমিত দাশ	৪৩
চিনি, হৃদ্‌রোগ ও গবেষণার ওপর বৃহৎ শিল্পের প্রভাব	সম্পাদক, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*	৪৫
সদ্য-ডাক্তারের প্রলাপ বিলাপ	ডা. অপূর্ব	৫২
চিঠি		
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঁচ বছর—পাঠকের চোখে		৫৪
শব্দছক-১	প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার	৫৫
প্রতিবেদন		
বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করেছে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখতে আপনার সহায়তা চাই		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

আমার বাচ্চা কিছু খায় না

ডারউইনের ভাগ্য ভালো তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব বিজ্ঞানে একেবারে পাকাপোক্ত প্রমাণিত হয়ে গেছে, নইলে এদেশের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এতদিনে তাঁর প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের তত্ত্বকে হয়তো মনে মনে খারিজ করে দিতেন। এদেশের বাচ্চাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছেই নেই, বিশেষ করে সে যদি একটু অবস্থাপন্ন ঘরের শিশু হয়; নেহাত মায়েরা জোর করে খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখেন। প্রজাতির নিজস্ব প্রবণতার ওপরে ছেড়ে দিলে আর দেখতে হত না, তারা সবাই না খেয়ে অকালে দেহত্যাগ করত। সুতরাং ডারউইন যে বলেছিলেন কোনো প্রজাতির প্রত্যেকে বেঁচে থাকার খাদ্যের জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়; দেখাই যাচ্ছে এইসব মনুষ্যশাবকগণ সে নিয়মের তোয়াক্কা করে না। অবশ্য হতদরিদ্র শিশুদের কথা আলাদা, তারা যা পায় তাই খায়—কিন্তু তাদের ব্যাপার হিসেবে আনা মুশকিল, কেননা তারা তো আর দরকার-অদরকারে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছোতে পারে না।

পাঠককে আর কনফিউজ না করে বলি, এদেশের যত্নশীল মায়েরা তাঁদের বাচ্চার খাওয়া নিয়ে বড়ো বেশি আতঙ্কে ভোগেন। শিশুর ওপর চলে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা এবং ডারউইনের তত্ত্ব মেনেই শিশু অতিরিক্ত খাবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো আত্মরক্ষামূলক রিফ্লেক্স ক্রিয়া হিসেবে সে খাওয়ার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। যেটা স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা ছিল, সেটা মায়েদের কঠিনতম গৃহকর্ম হয়ে যায়। মায়েরা একা নন পরিবারসুদ্ধু সবাই, এবং এঁদের ওপর নানা সামাজিক চাপ কাজ করে সে নিয়েও সন্দেহ নেই, কিন্তু খাওয়ানোর দায়িত্বটা তাঁদের হাতে থাকে বলে অতি-যত্নশীল ভূমিকায় তাঁরাই দৃশ্যমান হন।

আর এখানেই পরিত্রাতা হিসেবে দেয় নানা বাণিজ্যিক ‘পুষ্টিকর’ মুখরোচক খাদ্য। দু-টাকার জিনিসটাকে সুন্দর মোড়কে সাজিয়ে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করে দশটাকায় বিক্রি করে তারা, আর মধ্যবিত্ত আমরা সেটাকে শিশুপুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক এক স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে বাচ্চাকে গিলিয়ে অতীব আত্মপ্রসাদে ডুব দিই। কী কী প্রিজারভেটিভ রাসায়নিক ইত্যাদি এর সঙ্গে বাচ্চার পেটে যাচ্ছে সেটার খোঁজ নিতেও ভয় পাই, কেননা যদি ম্যাগি-র মতো ধরা পড়ে বড়ো কোম্পানি মানেই নিরাপদ খাদ্য নয়, তবে বাচ্চা না খেয়েই মরবে যে।

শুধু বিষাক্ত রাসায়নিকই একমাত্র বিপদ নয়, বাণিজ্যিক খাবারকে সুস্বাদু করে তুলতে ব্যবহৃত হয় প্রচুর চিনি আর তেল বা চর্বি। চর্বি নিয়ে তবু কিছু জন-সচেতনতা আছে, বাচ্চা ছোটোবেলা থেকে বেশি চর্বিযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যতে হার্টের রোগ ইত্যাদি হতে পারে, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু চিনিশিল্প কীভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রভাবিত করে চিনিকে কয়েক দশক জুড়ে ‘ডায়াবেটিস না থাকলেই নিরাপদ’ বলে প্রচার করে এসেছে, সেটাও আজ জানা গেছে।

এবারের *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকদের কাছে না-খেতে-চাওয়া বাচ্চার সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধের সঙ্গে রইল অচেনা চিনির তিক্ত-কথা।

আমার বাচ্চা কিছু খায় না

এটা এখন প্রায় সব মায়েরই অভিযোগ, অন্তত স্বচ্ছল পরিবারে। হঠাৎ করে কি বাচ্চারা সব বিগড়ে গেল? কিচ্ছু না খেয়েও তারা দিব্যি বেঁচে বর্তে থাকে, বড়ো হয়, চাকরি-বাকরিও করে—কেমন করে যে করে, সেও এক রহস্য। এসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন **ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে**।

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গবাসীর অতি সুপরিচিত এক জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকর পানীয়ের বিজ্ঞাপনের কথা একটু মনে করাই। দেখা যায় একজন মা তার বাচ্চার পিছনে খাবারের বাটি হাতে ধাওয়া করছেন এবং নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও খাদ্যের নির্ধারিত অংশের কিছুটা অভুক্ত রয়ে যাচ্ছে বাটিতে। সিদ্ধান্ত হয় বাচ্চার পুষ্টি থেকে যাচ্ছে অসম্পূর্ণ। সবশেষে ওই দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মায়ের মুশকিল আসান হিসাবে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে ওই অতি পরিচিত ও সুলভ স্বাস্থ্যকর পানীয়টির নাম যা কিনা শিশুর সম্পূর্ণ পুষ্টির দায়িত্ব নেবে এবং তাকে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে করে তুলবে অপ্রতিরোধ্য।

আমি এবং আমার প্রায় সমস্ত সহকর্মী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এই রকম দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মায়েদের সংখ্যা অনেক এবং তা ক্রম বর্ধমান। এঁরা চেম্বারে হাজির হন একটাই অভিযোগ নিয়ে 'আমার বাচ্চা কিছুই খায় না।' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা টিভির বিজ্ঞাপনী পুষ্টিকর আহারের প্রতুল বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও বাচ্চার খাওয়ার 'দক্ষতা'য় বা পরিমাণে খুশি হননি। অনেকে আবার তাঁর নিজস্ব নিদানটাও ডাক্তারবাবুকে লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেন—যেমন 'ভিটামিন সিরাপ, খিদে হওয়ার সিরাপ, হজমের সিরাপ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রতিবেদনে আমি আমার মতো করে কিছুটা এই সার্বজনীন সমস্যার সুরাহা করতে চেষ্টা করব। তবে আপনি/আপনারা আমার সমাধান সূত্রে তৃপ্ত হবেন কিনা সেটা নিয়ে অবশ্য আমি নিজেই সন্দিহান।

বাচ্চার কোন বয়সে কী খাওয়া উচিত ও কতটা খাওয়া উচিত

জীবনের প্রথম ছয় মাস মায়ের দুধই হল শিশুর একমাত্র খাদ্য। মায়ের দুধে ভিটামিন ডি ও লোহার পরিমাণ কিছু কম থাকে। তাই ওই দু-টি পুষ্টিদ্রব্য বুকের দুধের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে কেউ কেউ দিয়ে থাকেন।

ছয় মাস বয়েসের পরই পরিপূরক খাদ্য শুরু করা উচিত। যদিও ছয় মাস থেকে আরও বেশ কয়েক মাস দুধই হবে তার প্রাথমিক খাদ্য। মনে রাখা ভালো একবছর বয়স পর্যন্ত গোরুর দুধ সরাসরি কখনো বাচ্চাকে খাওয়ানো উচিত নয়। বুকের দুধ এবং বাজারের ফর্মূলা দুধই (Formula milk) শুধু চলতে পারে। একইসঙ্গে ক্রমশ বাড়তে থাকবে পরিপূরক শক্ত খাবারের পরিমাণ।

আসলে এই খাদ্যাভ্যাসের ক্রমপরিবর্তনটা নির্ভর করে বাচ্চা কীভাবে ও কতটা তাড়াতাড়ি 'খেতে শেখার দক্ষতা' অর্জন (Learning of feeding skills) করছে, তার ওপর। বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন ও তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন মোটামুটি এই রকম হতে পারে।

৬-৭ মাস: এই বয়সে বাচ্চারা চিবোনো বা কামড়ানো শেখে। একই সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের অ্যামাইলেজ উৎসেচক নিঃসরণ শুরু হয় যা দুধ ছাড়াও অন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

তাই এই বয়সই হল পরিপূরক খাদ্য শুরু করার আদর্শ সময়।

প্রথম প্রথম খুব নরম করে সেদ্ধ করা প্রায় তরল দানাশস্য জাতীয় খাবার। ১-২ টেবিল চামচ সারাদিনে ২-৩ বার। প্রতি তিন-চার দিন অন্তর খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার খাবারে বৈচিত্র্য আনার বিষয়টাও, যেমন—ডালে ভিজানো রুটি, দুধে

তারা টিভির বিজ্ঞাপনী পুষ্টিকর আহারের প্রতুল বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও বাচ্চার খাওয়ার 'দক্ষতা'য় বা পরিমাণে খুশি হননি।

ভিজানো পাউরুটি, দুধ সুজি, পায়েস, চটকানো আলু বা আপেল সেদ্ধ নরম পাকা কলা, পাকা পেঁপে ইত্যাদি।

তবে ৬-৭ মাসের বাচ্চার খাওয়ানোর সময় দেখা যায় তারা মুখ থেকে খাবার ফেলে দেয় বা কিছুতেই গিলতে চায় না। অনেক সময় বমিও করে। এটা অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ—প্রথমত এই সময় বাচ্চারা জিভ নড়িয়ে শক্ত খাবার গেলার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে শেখেনি এবং দ্বিতীয়ত 'গ্যাগ রিফ্লেক্স' (Gag Reflex—গলার পিছনের দেওয়ালে কিছু ঠেকলে বমি ভাব আসা)-এর অতি সক্রিয়তা। তাই এক্ষেত্রে হাল ছেড়ে না দিয়ে ক্রমাগত অভ্যাস করানোই একমাত্র উপায়। মনে রাখতে হবে সলিড খাবার বোতলে করে খুব পাতলা অবস্থায় কখনো খাওয়ানো যাবে না। তাতে শক্ত খাবার গেলা সে শিখবেই না।

৮-১২ মাস: এই সময় বাচ্চা জিহ্বা সঞ্চালনে শক্ত খাবার গিলে নিতে শেখে। একই সঙ্গে দুই আঙুলে কিছু তুলে মুখে দিতেও সে শেখে।

এই বয়সে খাবারের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়িয়ে যেতে হবে। সবরকম দানাশস্য, ডাল, শাকসবজি, মাছ, ডিম, মাংস ফলমূল সবই দেওয়া যেতে পারে। নিজে হাতে তুলে খেতে পারে এমন কিছু মেনুতে রাখতে হবে। কুচোনো নরম ফল, যেমন—পাকা পেঁপে, আম, সরু করে কেটে সিদ্ধ করা আলু, গাজর ইত্যাদি।

সারাদিনে দুধের পরিমাণ ৫০০ মিলিলিটার থেকে ৭৫০ মিলিলিটারের মধ্যে রাখা উচিত।

শক্ত খাবারের পরিবেশন সারা দিনে অন্তত ৩-৪ বার বা প্রয়োজনে আরও ১-২ বার অতিরিক্ত হতে পারে।

১-৩ বছর (টলোমলো পায়ে হাঁটার বয়স বা Toddler age)

মোটামুটি ১-১$^{১}/_{২}$ বছর বয়সের পর থেকেই শিশু বাড়ির সকলের জন্য তৈরি খাবারই খেতে শিখে যায়। এই বয়স থেকে বাচ্চাকে বাড়ির সবার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ানো অভ্যাস করাতে পারলেই ভালো।

সময়মতো সঠিক খাওয়া এবং পরিমাণ মতো খাওয়ার অভ্যাস তৈরিটাই সবচেয়ে গুরুত্বের। মনে রাখতে হবে শিশুর ব্রেনের বিকাশের শতকরা আশি ভাগ প্রথম ২ বছরেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাই ওই সময়ের পর্যাপ্ত পুষ্টিই দিতে পারে বুদ্ধির বিকাশ।

কমার্শিয়াল খাবার কতটা গুরুত্বপূর্ণ

এটা বোধহয় আমাদের সভ্যতার ক্রম-আধুনিকীকরণের আরেকটা ফল। সমস্ত সমস্যার চটজলদি হাতে-গরম সমাধান পেলে সময় ও শ্রম নষ্ট করার অবকাশ আমাদের কারোরই নেই। মনে রাখতে হবে শিশুর বৃদ্ধির জন্য দরকার সুষম আহার যা খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার-ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য। সুষম খাদ্য কোনো বিজাতীয় বস্তু থেকে তৈরি হয় না। বাড়িতে আমরা প্রতিদিন যা খাই তার মধ্যেই থাকে এই সব উপাদান। দামি প্যাকেটজাত খাবার মানেই তার চাইতে ভালো—এমনটা নয়।

বাড়ির তৈরি খাবারে সুবিধা হল—আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি আপনি সরাসরি জানতে পারলেন বাচ্চাকে কী খাওয়ালেন, খাবার হল টাটকা, নুন চিনি, তেলের পরিমাণ আপনার নিয়ন্ত্রণে রইল এবং সর্বোপরি খাদ্য হল

সংরক্ষণের ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য (Preservative) থেকে মুক্ত। দৈনন্দিন বৈচিত্র্যও বাড়ির খাবারে অনেক বেশি আনা সম্ভব।

তবে শিশুর খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আনতে সারাদিনে দু-এক বার কমার্শিয়াল খাদ্য দিলেই ভয়ানক ক্ষতিকর, তা নয় অবশ্যই। শুধু মনে রাখতে পারেন দামি বাণিজ্যিক খাবার না খেয়েও আপনি নিজেই জীবনে বড়ো ও সফল হয়েছেন। হরলিক্স বাজারে আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন বোস জন্মেছিলেন, তাঁরা খুব খারাপ কিছু হননি বোধহয়।

হরলিক্স বাজারে আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন বোস জন্মেছিলেন, তাঁরা খুব খারাপ কিছু হননি বোধহয়।

বাচ্চা কিছুই খাচ্ছে না—সত্যি/মিথ্যা

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'বাচ্চা কিছুই খাচ্ছে না' অভিযোগটিই অসার। বাচ্চার পুষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় বাচ্চার ওজন বৃদ্ধির হার থেকে। মোটামুটিভাবে বয়সের অনুপাতে ওজন বৃদ্ধির সমীকরণ হল—

পরিণত ও স্বাভাবিক ওজনের নবজাতকের ক্ষেত্রে

- জন্মের পর স্বাভাবিক ওজন হ্রাস ও সম ওজনে ফিরে আসা-১০ দিন
- তারপর ৩ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম করে।
- তারপর বাচ্চার যত মাস বয়স +৯/২—১ বছর পর্যন্ত
- ১-৬ বছর—(২× বাচ্চার যত বছর বয়স+৮)! অঙ্কের পরিভাষায় (২x+৮), যেখানে x হল বাচ্চার বয়স (বছরে)
- ৭-১২ বছর—৭× (বাচ্চার যত বছর বয়স)-৫/২ বা ৭x-৫/২

গড়ে ব্যাপারটি দাঁড়ায় জন্মের ওজন W kg হলে

৬ মাসে ২ × W ৩ বছরে ৫ × W

১ বছরে ৩ × W ৫ বছরে ৬ × W

২ বছরে ৪ × W

শিশুর পুষ্টি সম্পূর্ণ না হলে তার ওজন কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়বে না। তবে এক্ষেত্রে Growth Chart -এর সাহায্য নিলে সবচেয়ে ভালো।

এছাড়াও বাচ্চার পুষ্টি অসম্পূর্ণ থাকলে—

- বাচ্চা অতিরিক্ত খিটখিটে হয়।
- খেলাধুলো করে না।

❖ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

❖ শরীরে ভিটামিনের অভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাচ্চার ওজন হিসাবে দেখলে তাই দেখা যায় প্রায় সব বাবা মায়ের ভয়টাই সম্পূর্ণ অমূলক।

তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন বাড়ির বাচ্চারও বয়স অনুপাতে ওজন কম। এবং প্রকৃতই এই শিশুরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার খায় না।

বাচ্চার খাবারে অনীহা তৈরির সম্ভাব্য কারণসমূহ

এই সমস্যার সূত্রপাত একেবারে গোড়ায়, যখন থেকে পরিপূরক আহার শুরু হয়েছে।

❖ প্রথম থেকেই বাচ্চার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একই খাবার বরাদ্দ করা। খাবারে বৈচিত্র্য না এনে তার খিদে পাওয়া না পাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে খাবার নিয়ে জোর জুলুম শুরু করা।

❖ জামা কাপড় নোংরা হওয়ার ভয়ে বাচ্চাকে নিজে হাতে খেতে না দেওয়া।

❖ যে বয়সে বাচ্চা শক্ত খাবার চিবিয়ে খেতে শিখছে তখনও তাকে সেই ধরনের খাবার না দেওয়া।

❖ বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় ধৈর্যের অভাব। ১-৩ বছরের বাচ্চারা ফেলে ছড়িয়ে গায়ে মেখে খেতেই ভালোবাসে। নতুন খাবারের স্বাদ গন্ধ তারা এভাবেই পেতে চায়। সুতরাং খাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাকে নিজে হাতেও খেতে দিতে হবে। এতে খাবার এবং সময় দুইই নষ্ট হলেও উপায়ান্তর নেই।

❖ ১-৩ বছরের বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র যেকোনো খাবার হজমের জন্যই পরিণত। তাই এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকার সমস্ত খাবারই তাকে পরিবেশন করতে হবে। কোনো বিশেষ খাবার অপছন্দ হলে জোর না করে বেশ কিছুদিন পর আবার দিয়ে দেখুন।

❖ বাজারে সুলভ প্যাকেটজাত চটকদার খাবার উপহার বা উৎকোচ হিসাবে দিলেও খিদে নষ্ট করার পক্ষে তা যথেষ্ট। এর মধ্যে অতিরিক্ত লবণ, বেশি মিষ্টতা ও ফ্যাটযুক্ত সমস্ত খাবারই পড়ে। যেমন— পোটাটো চিপস্, কেক, পেস্ট্রি, চকোলেট, ফ্রুটজুস, কোলা, বিস্কুট, ললিপপ! অন্য যেকোনো সুগন্ধযুক্ত পানীয় যেমন, ফ্রুটি, অ্যাপি ফিজ ইত্যাদি।

❖ খাওয়ানোর সময় বাচ্চাকে মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত করার জন্য অনেকে টিভি চালান। মোবাইল চালান, হাতে খেলনা দেন। এগুলো তাকে খাওয়ার আনন্দটাই পেতে দেয় না।

❖ আবার অনেকক্ষেত্রে পেটে কৃমি থাকলে শরীরে আয়রনের অভাব হলে বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে খিদে চলে যায়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানো দরকার।

তাহলে উপায়

প্রথমেই বলে রাখি সুষম আহারের পরিপূরক কোনো ভিটামিন সিরাপ বা টনিক বা বাণিজ্যিক খাবার নয়। হজমের এনজাইম বলে বিক্রি হয় যেসব সিরাপ তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে চিকিৎসকরা যথেষ্ট সন্দিহান। ডাক্তারি শাস্ত্রের বইগুলি খিদে না হওয়ার চিকিৎসায় এই ধরনের সিরাপের বা খাদ্যের নিদান দেয় না।

'খিদে খোলা'-র সিরাপ বলে যেগুলো বাজারে চালু, তাদের সম্পর্কেও দু-চার কথা বলি। সাধারণত তিন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। প্রথম ধরনটা হল কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধের মিশ্রণ— কার্যপ্রণালী অজানা এবং খিদে হওয়াটাও ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয় ধরনটা হল অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ (Antihistaminics) যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল খিদের ভাবটা বাড়ানো। কিন্তু এই প্রভাবও সাময়িক এবং এ ওষুধের অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তৃতীয় ধরনটা হল কিছু ভিটামিন-মিনারেল ও অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ মিশ্রণ। এক্ষেত্রেও প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

এবার আসি কার্যকরী উপায়ের কথায়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে চটজলদি ও সহজ সমাধান নেই। বাচ্চাকে ঠিকমতো খাওয়ানো অভ্যেস করানোই হল চ্যালেঞ্জ।

❖ বাচ্চার খিদে সবদিন সমান হয় না। এমনকী সারাদিনও একরকম থাকে না। তাই সপ্তাহে কোনোদিন বেশি খাওয়া আর কোনোদিন অনেকটাই কম খাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই কোনোদিন কম খেলে জোর করবেন না যাতে তার খাবারের প্রতি ভয় বা বিতৃষ্ণা তৈরি হয়।

❖ সময় মেনে খাবার পরিবেশন করুন। এক বেলা কম খেলে অন্য কোনো মুখরোচক খাবার দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করবেন না। খিদে পেলে তবেই খেতে দিন, নইলে আবার নির্দিষ্ট সময়ে। উপঢৌকন স্বরূপ অসময়ে সামান্য বাজে খাবারই সঠিক খাওয়ার সময়ের খিদে নষ্ট করে দিতে পারে।

❖ বাচ্চা বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধের পরিমাণ কমিয়ে ফেলাটাও জরুরি। ৬ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে সারাদিনে ৫০০ মিলিলিটার ও তারপর সারাদিনে ২৫০ মিলিলিটার দুধই যথেষ্ট। এমনকী এক বছরের পর দুধ না দিলেও চলে। আসলে দুধে যে অতিরিক্ত ফ্যাট থাকে তা অনেকক্ষণ খিদের ভাবকে দমিয়ে রাখে।

❖ খাবারে বৈচিত্র্য আনাটাও গুরুত্বপূর্ণ। রংচঙে ও সুস্বাদু ফল, সবজি, শুঁটি, পরিবেশন করুন।

❖ বাচ্চাকে নিজে হাতে খেতে দিন। এতে খাবারের প্রতি তার আগ্রহ বাড়বে।

❖ একটু বড়ো হলেই (১½-২ বছর) পরিবারের সঙ্গে খেতে বসান। খাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে নিজে হাতে খেতেও সময় দিন।

❖ খাওয়ানোর সময় টিভি, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। এতে বাচ্চার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

❖ থালায় অল্প খাবার নিয়ে শুরু করুন। প্রথমেই বেশি খাবার দেখলে অনেক বাচ্চারই খাবার ইচ্ছেটা চলে যায়। শেষ হলে আবার অল্পই দিন। তবে মনে রাখতে হবে ১ বছর বয়সের নীচে বাচ্চা যতটা খায় পরবর্তী বয়সে সেই অনুপাতে অনেকটাই কম খায়। এর কারণ হল এই সময় বৃদ্ধির হারও কিছুটা কমে যায়।

❖ অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাকে বাজার নিয়ে গিয়ে পছন্দমতো খাবার কেনা থেকে শুরু করে রান্না ও পরিবেশনে তাকে গুরুত্বসহ সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিলে খাওয়ার উৎসাহ অনেকটাই বাড়ে।

অনেকেই অনুরোধ জানান যে বাচ্চার খিদে হচ্ছে না—একটু লিভারের দোষ আছে কিনা দেখুন। তাদেরকে বলি নিজেদের কৃতকর্মের দোষ বাচ্চার লিভারকে দিয়ে তাকে আরেকটা লিভার টনিক খাওয়াবেন না দয়া করে।

পরিশেষে বলি বাচ্চার খিদে যদি প্রকৃতই কমে গিয়ে থাকে তার জন্য প্রায় সবসময়েই আপনিই দায়ী। তাই তাকে জোর, মারধর ইত্যাদি না করে ধৈর্যশীল হয়ে সমাধানের উপায়গুলো পরখ করুন। অন্য কোনো সহজ সমাধান নেই। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সব্যসাচী পান্ডে, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের চিকিৎসক।

Advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

সদ্যোজাত শিশুর গা হলুদ!

ডা. মানস কুমার মহাপাত্র

চিত্র ১. সদ্যোজাতর জন্ডিস

গা হলুদ হওয়া অর্থাৎ 'জন্ডিস' আমাদের খুবই পরিচিত লক্ষণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিভারের রোগে জন্ডিস হয়। সমাজে এখনও জন্ডিস কমানোর জন্য বিবিধ লৌকিক বিধান চালু আছে—যেমন জন্ডিসের মালা, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি।

জন্ডিস যেকোনো বয়সে হতে পারে। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর জন্ডিস কারণগত এবং চিকিৎসাগত দিক থেকে অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। প্রায় সমস্ত সদ্যোজাত শিশুর জন্ডিস হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৬০-৭০ শতাংশ) কোনো চিকিৎসাই লাগে না—নিজে থেকে সেরে যায়।

সদ্যোজাত শিশুদের জন্ডিস কেন হয়

আমাদের রক্তে লাল রক্তকণিকার মধ্যে থাকে 'হিমোগ্লোবিন'। এই রক্তকণিকার গড় আয়ু ৭২ দিন। যখন এই রক্তকণিকা মরে যায় তখন তার ভেতরকার হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে যায় ও বিলিরুবিন এবং অন্য কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি হলে গা হলুদ হয় চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়, মূত্রও হলুদ হয়। যকৃৎ এই বিলিরুবিনকে পিত্তের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে পাঠিয়ে দেয়—তারপর তা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

সদ্যোজাত শিশুর শরীরে হিমোগ্লোবিন বেশি থাকে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুদের শরীরে বেশি পরিমাণে রক্তকণিকা (Red Cell) ভেঙে যায় ও এদের শরীরে বেশি পরিমাণে বিলিরুবিন তৈরি হয়।

অন্যদিকে, শিশুদের লিভারের কার্যক্ষমতা প্রথম ৬-৭ দিন বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকার জন্য তুলনায় কম পরিমাণে বিলিরুবিন শরীর থেকে বেরোতে পারে। সেজন্য অধিকাংশ সদ্যোজাত শিশুর জন্ডিস হয়। এই জন্ডিসকে Physiological বা শারীরসংস্থানগত স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া জন্ডিস বলা হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে (শতকরা ৫-১০ ভাগ) স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া এই জন্ডিস অনেক বেশি হয়ে ক্ষতিকারক হতে পারে। যেমন—

১. মা ও শিশুর মধ্যে রক্তের গ্রুপের অমিল [(blood group incompatibility (ABO & Rh)]। এছাড়া G-6-P-D নামক উৎসেচকের অভাব, শরীরে অত্যধিক লাল রক্তকণিকা থাকা (Policythemia), জন্মগত রক্তের রোগ যেখানে রক্ত সহজে ভেঙে যায় (থ্যালাসেমিয়া, হেরেডিটারি স্পেরোসাইটোসিস)—এই সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ত বেশি পরিমাণে ভেঙে যায়।
২. বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে জন্মায়, যদি জন্মগত কোনো লিভারের রোগ বা সংক্রমণ (যেমন কয়েকটা সংক্রামক রোগ যাদের ডাক্তাররা এক সঙ্গে TORCH ইনফেকশন বলেন), অথবা জন্মের পরবর্তী সংক্রমণ (Sepsis)—এই সব ক্ষেত্রে লিভারের কার্যক্ষমতা অনেক কম থাকে, তাই বিলিরুবিন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম নির্গত হয় ও বেশি জন্ডিস হয়।

এই জন্ডিসকে 'রোগ' (Pathological) অর্থাৎ ক্ষতিকারক জন্ডিস বলা হয়।

বেশি জন্ডিস ক্ষতিকারক কেন

আমাদের মস্তিষ্ক এবং রক্ত বিশেষভাবে পৃথক থাকে। পৃথক রাখার এই ব্যবস্থাকে ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার (BBB—বিবিবি) বলে। বিলিরুবিন সাধারণত এই বিবিবি অতিক্রম করতে পারে না। শিশুদের প্রথম ৫-৬ দিন বয়স

বিলিরুবিনের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি থাকলে তা সহজেই মস্তিষ্কে চলে যেতে পারে ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে।

পর্যন্ত এই বিবিবি অপরিণত থাকে। তাই রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি থাকলে তা সহজেই মস্তিষ্কে চলে যেতে পারে ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে। বাচ্চা যদি জন্মের পর দেরি করে কাঁদে, বা জন্ম পরবর্তী সংক্রমণ হলে এই বিবিবি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বিলিরুবিন মস্তিষ্কে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এবং মস্তিষ্কের এর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও বাড়ে।

শিশুদের জন্ডিস কী করে বুঝবেন?

চিত্র ২. জন্ডিসে অসুস্থ সদ্যোজাত শিশু

নবজাতকের জন্ডিস চামড়ার নীচের কোষকলার (Tissue) হলুদ রং দেখে বোঝা যায়। বিলিরুবিনের পরিমাণ যত বেশি হয় শরীরের তত নীচের দিকের অংশ হলুদ হয়। অর্থাৎ কম বিলিরুবিনের ক্ষেত্রে মুখ, বুক বা পেট হলুদ হবে। বেশি বিলিরুবিন হলে পেটের নীচের অংশ, থাই, পা, পায়ের এবং হাতের চেটো হলুদ হবে। আপনার হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনি, বুক, নাভির উপরের এবং নীচের পেট, থাই, পা, পায়ের এবং হাতের তালুর চামড়ায় অল্প চাপ দিয়ে (যাতে সেখানে রক্তবাহী জালকগুলোতে রক্ত খুব কমে যায় ও রক্তের লাল রঙের আভাস হলুদ রং দেখতে বাধা না দেয়) সরিয়ে নিয়ে চামড়ার নীচের কোষ কলার (Tissue) রং সূর্যের আলোয় (Day light) দেখতে হবে হলুদ হয়েছে কিনা। শরীরের কোন অংশ পর্যন্ত হলুদ হয়েছে তা দেখে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব।

কোনো রক্ত পরীক্ষা ছাড়া কী করে বুঝবেন জন্ডিস 'স্বাভাবিক' (Physiological) না 'রোগ' (Pathological)

যে সমস্ত শিশু সঠিক সময়ে জন্মায় তাদের ক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক' জন্ডিস জন্মের ২৪ ঘণ্টার পরে এবং ৩ দিন বয়সের মধ্যে দেখা দেয়। সর্বোচ্চ হয় ৪-৫ দিন বয়সে, কমে যায় ৭-১০ দিনের মধ্যে। যে সমস্ত শিশু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে জন্মায় তাদের ক্ষেত্রে বিলিরুবিন বা স্বাভাবিক জন্ডিস সর্বোচ্চ হয় ৫-৭ দিনের মধ্যে এবং কমে যায় ১০-১৪ দিনের মধ্যে।

ক্ষতিকারক জন্ডিস সাধারণত ২৪ ঘণ্টা বয়সের মধ্যেই দেখা যায়

দেখা গেছে যে এই জন্ডিসে বিলিরুবিনের পরিমাণ কম থাকে, ফলে কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। মা-কে বেশিবার দুধ খাওয়াতে বলা হয়।

'রোগ' (Pathological) বা ক্ষতিকারক জন্ডিস সাধারণত ২৪ ঘণ্টা বয়সের মধ্যেই দেখা যায়। হাত এবং পায়ের তালু হলুদ হয়। বাচ্চার 'ন্যাপি' বা প্রস্রাব মোছা/ঢাকা দেবার সাদা কাপড়ে যদি মূত্র লাগার জায়গায় হলদেটে দাগ দেখা যায়, তাহলে সেই জন্ডিসে বিলিরুবিনের পরিমাণ যাই হোক না কেন তা ক্ষতিকারক।

এ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুকে অবশ্যই দেখানো উচিত ও রক্তের পরীক্ষা করে জন্ডিসের কারণ জানা দরকার। এদের খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চার ক্ষতিকারক জন্ডিস হতে পারে—তাই সতর্ক হবেন।

১. যদি জন্ডিস ২৪ ঘণ্টা বয়সের মধ্যে ধরা পড়ে।

২. মা ও শিশুর রক্তের গ্রুপের অমিল। যেমন 'মা' O+ve; শিশু A+ve উল্লেখ্য প্রতিটি মায়ের রক্তের গ্রুপ প্রেগনেন্সি চেক আপ-এর সময় করা থাকে। এবং প্রতিটি শিশুর জন্মের পর নাড়ির রক্ত (Cord blood) থেকে গ্রুপ পরীক্ষা করা উচিত।

৩. শিশু যদি ৩৫ বা ৩৬ সপ্তাহের আগে জন্ম নেয়।

৪. যদি আগের বাচ্চাগুলির ক্ষেত্রে জন্ডিসের চিকিৎসা অর্থাৎ নীল আলোর নীচে রাখা (Phototherapy) অথবা রক্ত পরিবর্তন (Exchange transfusion)-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৫. প্রসবের সময় বাচ্চার মাথার হাড়ের উপরে যদি বেশি পরিমাণে রক্ত জমে (Large Cephal-hematoma), সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে জন্ডিস হতে পারে।

৬. মা যদি বাচ্চাকে পরিমাণ মতো দুধ খাওয়াতে না পারে সেক্ষেত্রেও বেশি জন্ডিস হতে পারে—তবে এই জন্ডিস ততটা ক্ষতিকারক হয় না।

এছাড়াও আরও অনেক কারণে ক্ষতিকারক জন্ডিস হতে পারে।

কী কী কারণে জন্ডিস অনেকদিন স্থায়ী হয়

যদি জন্ডিস ৩ সপ্তাহের বেশি থাকে অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত। এক্ষেত্রে নীচের কারণগুলি সর্বদা খুঁজে দেখা উচিত।

১. মায়ের দুধ খেয়ে জন্ডিস (Breast Milk Jaundice)

শতকরা ২-৩ ভাগ শিশু যারা শুধুমাত্র বুকের দুধ খায় তাদের এটা হয়। কয়েকজনের ক্ষেত্রে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা খুব বেশি (10 mg/dl) পর্যন্তও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে নীল আলোর নীচে শিশুকে রাখতে হতে পারে। তবে এই জন্ডিসের চিকিৎসায় কখনোই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা উচিত নয়। অন্য কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে তবেই এই ধরনের জন্ডিসের কথা ভাবা হয়। এই জন্ডিস ধীরে ধীরে কমে যায়।

২. ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস (Breast Feeding Jaundice)

পরিমাণের চেয়ে কম দুধ খেলে শিশুদের অনেকদিন, এমনকী ২-৩ মাস বয়স পর্যন্ত, জন্ডিস থাকতে পারে।

৩. থাইরয়েড হরমোনের অভাব (Hypothyroidism)

প্রতিটি শিশুর থাইরয়েড-এর পরীক্ষা করা উচিত। থাইরয়েড হরমোন শিশুদের মস্তিষ্ককে পরিণত করতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর অভাবে অনেকদিন জন্ডিস থাকে।

৪. বড়ো ধরনের গুপ্ত রক্তপাত (Concealed Bleeding)

শরীরের কোথাও থাকলে যেমন—মাথার হাড়ের উপরে বড়ো ধরনের রক্তপাত যা জন্মের সময় হতে পারে (large cephalhematoma)।

৫. কম পরিমাণে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে রক্ত ভাঙতে থাকলে (Ongoing hemolysis)

চিত্র ৩. সদ্যোজাতর জন্ডিসে আলোক-চিকিৎসা

মা ও শিশুর রক্তের গ্রুপের অমিল বা জন্মগত রক্তের রোগের (থ্যালাসেমিয়া, G-6-P-D-র অভাব) কারণে ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে রক্ত ভাঙতে থাকে। জন্ডিসও অনেকদিন থাকে।

৬. পেচ্ছাপের রাস্তার সংক্রমণ

ছোটো বাচ্চার/শিশুর মূত্রনালীর সংক্রমণ কিন্তু খুব বিরল নয়। শিশুর জ্বর বা মূত্রনালীর সংক্রমণের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। এতে জন্ডিস অনেকদিন থাকে।

৭. কোলেস্টাসিস (Cholestasis)

এই রোগে মূত্র কালো (Dark urine) রঙের হয় এবং ন্যাপিতে দাগ ফেলে। পায়খানা সাদাও হতে পারে। এই ধরনের শিশুর খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার। কারণ কিছু ক্ষেত্রে ২ মাস বয়সের মধ্যে রোগের কারণ জানা দরকার; সঠিক সময়ে ধরা না পড়লে এই রোগে যকৃৎ প্রতিস্থাপন (Liver Transplantation) ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

৮. আরও অন্যন্য কারণ

এগুলো বিরল, এখানে আলোচনার পরিসর নেই।

কী কী করবেন

অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন যদি—১. নাভির নীচে জন্ডিস নামে। ২. জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জন্ডিস দেখা যায়। ৩. জন্ডিস ১৪ দিনের বেশি থাকে। ৪. উপরে আলোচিত 'কোন কোন ক্ষেত্রে সতর্ক হবেন' অংশটির মতো কিছু থাকে। ৫. বুকের দুধ বেশি বার খাওয়াবেন।

কী কী করবেন না

১. ওঝা বা গুণিন-এর কাছে যাবেন না।
২. কোনো ধরনের তেল মালিশ করবেন না।
৩. জন্ডিস কমানোর জন্য সূর্যের আলোর নীচে বাচ্চাকে রাখবেন না।

সর্বোপরি আরও একবার মনে করিয়ে দিই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন্ডিসের চিকিৎসা লাগে না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন আর কোন ক্ষেত্রে নয় তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত।

সুতরাং হাসপাতালে জন্মানো যে সমস্ত শিশুর হাসপাতাল থেকে ছুটি ৩ দিন বয়সের মধ্যে হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নেবেন। এই সময় জন্ডিস বেশি হল কিনা এবং বাড়িতে দুধ পরিমাণমতো খাচ্ছে কিনা তা দেখে নেওয়া জরুরি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মানস কুমার মহাপাত্র, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, বর্তমানে একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

পেটে জল জমা বা অ্যাসাইটিস

অ্যাসাইটিস মানে পেটে জল জমা। জল জমতে পারে নানান ধরনের কারণে। বিষয়টা খুব সহজবোধ্য নয়। সহজ করে লেখার চেষ্টা করেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

পেটের ভেতরে এক পর্দা আছে যার নাম পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়ামের দুটো স্তর—একটা স্তর পেটের ভেতরের দেওয়ালে লেগে থাকে, অন্য স্তরটা পেটের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে ঢেকে রাখে। পেরিটোনিয়াম থেকে এক তরল বেরোয় যার কাজ পেরিটোনিয়ামকে পিচ্ছিল রাখা যাতে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের ওপর দিয়ে সহজেই পিছলে যেতে পারে। পেরিটোনিয়ামের এই দুই স্তরের মধ্যে যখন বেশি তরল জমে, সেই অবস্থাটাই হল অ্যাসাইটিস।

মাঝারি গড়নের কোনো রোগীর অ্যাসাইটিস ডাক্তারি পরীক্ষায় বুঝতে গেলে অন্তত ১৫০০ মিলিলিটার তরল পেটের ভেতরে জমা চাই। রোগা, ছোটো গড়নের কারোর অবশ্য একটু কম জমলেও বোঝা যায়। আবার মোটা কোনো রোগীর ১৫০০ মিলিলিটারের চেয়েও অনেকটা বেশি তরল না জমলে ডাক্তার পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন না। আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় অবশ্য মোটামুটি ৫০০ মিলিলিটার তরল জমলেই বোঝা যায়।

অ্যাসাইটিসে যদি জীবাণু-সংক্রমণ হয়ে না থাকে এবং হেপাটো-রেনাল সিনড্রোম যদি না থেকে থাকে তাহলে অ্যাসাইটিসকে তিনটে ধাপ (grade)-এ ভাগ করা হয়:

১. অল্প অ্যাসাইটিস: ধরা পড়ে কেবল আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায়।
২. মাঝারি অ্যাসাইটিস: এতে পেটে দুইদিকে সমান ভাবে কিছুটা ফুলে থাকে।
৩. বেশি অ্যাসাইটিস: পেট খুব ফুলে থাকে।

চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না (Refractory) এমন অ্যাসাইটিস আবার দু-রকমের:

১. অন্তত এক সপ্তাহ খাদ্যে সোডিয়াম অর্থাৎ লবণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বেশি মাত্রায় ডাইয়ুরেটিক বা মূত্রবর্ধক দিয়েও যদি অ্যাসাইটিস না কমে, তাকে বলে ডাইয়ুরেটিক-প্রতিরোধী অ্যাসাইটিস (diuretic-resistant ascites)।
২. আবার মূত্রবর্ধক ব্যবহার-জনিত জটিলতার জন্য যদি কার্যকরী মাত্রায় মূত্রবর্ধক দিয়ে চিকিৎসা না করা যায় তাহলে তাকে বলে ডাইয়ুরেটিক-ইনট্র্যাক্টেবল অ্যাসাইটিস (diuretic-intractable ascites)।

অ্যাসাইটিসের কারণ

১. সিরোসিস: লিভারের সিরোসিসের রোগীরা সবচেয়ে বেশি যে লক্ষণ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন তা হল অ্যাসাইটিস। অ্যাসাইটিস রোগীদের মোটামুটি ৭৫%-এর সিরোসিস থাকে। আবার সিরোসিস রোগীদের প্রায় ৫০%-এর বছর দশেকের মধ্যে অ্যাসাইটিস দেখা দেয়। লিভারের সিরোসিসে অন্তিম স্তরে পায়ে জল জমা, ফুসফুসের আবরণীতে জল জমা (প্লুরাল এফিউশন)ও দেখা যায়। সিরোসিসের রোগী অনেকদিন ধরে ভালো ছিলেন, হঠাৎ করে তাঁর অ্যাসাইটিস দেখা দিল, এমনটা হলে তাঁর লিভারের

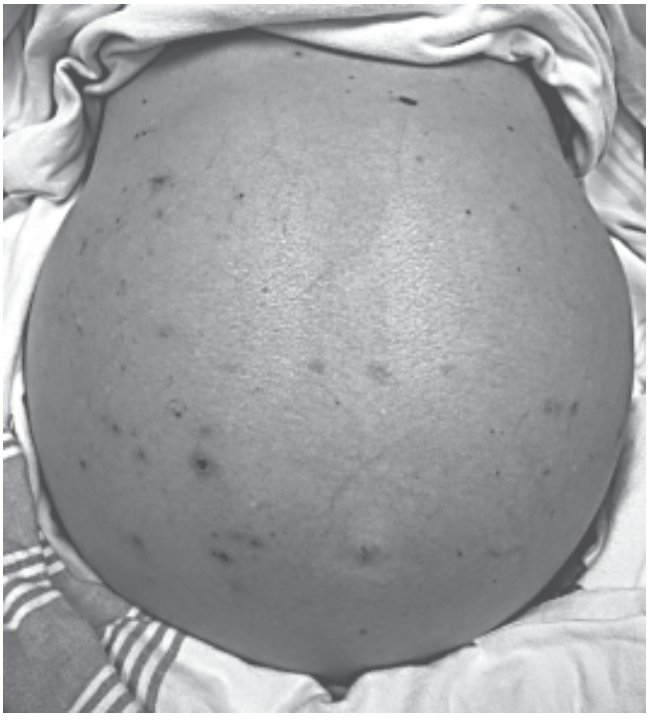

কোষের ক্যানসার (hepatocellular carcinoma) হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

২. অ্যাসাইটিস-এর ১৫% রোগীর ক্যানসার পেটে জল জমার কারণ। ক্যানসার হতে পারে পরিপাকতন্ত্রের, যেমন—পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার, লিভার কোষের ক্যানসার বা অন্য অঙ্গের ক্যানসার যা লিভারে বাসা বেঁধেছে। এছাড়া মহিলাদের ডিম্বাশয়ের ক্যানসার, লসিকাগ্রন্থির ক্যানসার, অন্যত্র থেকে পেটের গহ্বরে বাসা বাঁধা ক্যানসারও অ্যাসাইটিসের কারণ হতে পারে।

৩. হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা বা হার্ট ফেলিয়োর
৪. নেফ্রোটিক সিনড্রোম
৫. যক্ষ্মা
৬. প্যাংক্রিয়াটাইটিস বা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ
৭. অন্যান্য দুর্লভ কারণগুলির মধ্যে আছে হাইপোথাইরয়েডিজম।

রোগী কী সমস্যা নিয়ে আসেন?

- পেট ফোলা
- জল জমার ফলে ওজন বাড়া
- পেটে জল যত বেশি জমে তত অস্বস্তি বাড়ে। ক্যানসারের কারণে অ্যাসাইটিস হলে ব্যথা থাকতে পারে।

- গা-বমি ভাব ও খিদে কমে যাওয়া—পাকস্থলী ও অন্ত্রের ওপর অ্যাসাইটিসের চাপের কারণে।
- শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকা: এমনটা হয় দু-টি কারণে—নিম্ন মহাশিরায় অ্যাসাইটিসের চাপ পড়ায় পা থেকে শিরায় রক্ত-চলাচল কমে যায়, এবং মধ্যচ্ছদায় অ্যাসাইটিসের চাপের কারণে ফুসফুস ঠিকমতো ফুলতে পারে না।
- যে রোগের কারণে অ্যাসাইটিস হয়েছে, তার উপসর্গ থাকতে পারে।

রোগীর যে ঝুঁকিগুলির কথা জানতে হয়, সেগুলি হল: মদ্যপান, আগে জন্ডিস হয়েছে কিনা, দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস বি বা সি সংক্রমণ, স্থূলতা, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, টাইপ ২ ডায়াবেটিস।

রোগ-লক্ষণ অর্থাৎ রোগীকে পরীক্ষা করে কী পাওয়া যায়?

- শোয়া অবস্থায় পেটের দু-পাশ ফোলা লাগে, দাঁড়ানো অবস্থায় তলপেট ফোলা লাগে।
- পেটের ভেতরকার চাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য নাভিতে বা কুঁচকিতে হার্নিয়া হতে পারে।
- সিরোসিসের জন্য জন্ডিস, মাংসপেশি শুকিয়ে যাওয়া, পুরুষের স্তন-বৃদ্ধি, স্পাইডার নেভি (অর্থাৎ মাকড়সার মতন দেখতে শাখাপ্রশাখাসহ লাল শিরা চামড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাওয়া), হাতের তালুতে লালভাব।
- পাকস্থলী অগ্ন্যাশয় বা লিভারের ক্যানসারের কারণে পেরিটোনিয়াল পর্দায় ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে থাকলে অনেক সময় নাভিতে একটা শক্ত গুটি দেখা যায়। উপরিভাগে ক্যানসার হয়ে থাকলে অনেক সময় বাম দিকের কণ্ঠার হাড়ের উপরে গ্ল্যান্ড ফোলে।

ডাক্তার কীভাবে পেট ঠুকে বোঝেন পেটে জল জমেছে কিনা তার আলোচনা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে। তবে আগেই বলেছি অন্তত ১৫০০ মিলিলিটার জল না জমলে ডাক্তারি পরীক্ষায় অ্যাসাইটিস বোঝা যায় না, তখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফিই ভরসা।

অ্যাসাইটিস বাড়ছে কিনা বোঝার জন্য

- পেটের মাপ নেওয়া হতে থাকে
- ওজন নেওয়া হতে থাকে।

অ্যাসাইটিসে পরীক্ষানিরীক্ষা

পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্দেশ্য হল:

- অ্যাসাইটিস আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া
- অ্যাসাইটিসের কারণ খোঁজা
- অ্যাসাইটিসের কারণে কোনো জটিলতা হচ্ছে কিনা দেখা।

যে পরীক্ষা করা হয় সেগুলি এইরকম—

রক্ত পরীক্ষা

- রক্তকোষগুলির সংখ্যা মাপা (full blood count)
- কিডনি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা দেখার জন্য পরীক্ষা—রক্তরসে ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন, ইত্যাদি মাপা।
- লিভারের কার্যক্ষমতা মাপা (liver function tests)
- রক্ত-জমাট বাঁধার পরীক্ষা (clotting screen)
- থাইরয়েডের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা (thyroid function tests)
- সিরোসিসের কারণে অ্যাসাইটিস হয়েছে নিশ্চিত হওয়া গেলে সিরোসিসের কারণ খুঁজতে হেপাটাইটিস বি ও সি-র অ্যান্টিবডি পরীক্ষা।

বিশেষ ছবি তোলা

- আলট্রাসোনোগ্রাফিতে অ্যাসাইটিস বোঝা যায় তো বটেই তাছাড়া অ্যাসাইটিসের কারণ ডিম্বাশয়ের ক্যানসার বা অন্য জায়গা থেকে লিভারে বাসা-বাঁধা ক্যানসারের মতো কিছু হলে তাও জানা যায়।
- বুকের এক্স-রে-তে প্লুরাল এফিউশন, ফুসফুসে অন্য জায়গা থেকে এসে ক্যানসারের বাসা বাঁধা, হার্ট ফেলিয়োর ইত্যাদি বোঝা যায়।
- আলট্রাসোনোগ্রাফিতে অ্যাসাইটিসের কারণ বোঝা না গেলে অনেক সময় এম আর আই করা হয়।

অ্যাসাইটিসের তরল পরীক্ষা

সুঁচ দিয়ে পেট ফুটো করে সিরিঞ্জ দিয়ে তরল টেনে পরীক্ষা করলে অনেক সময় অ্যাসাইটিসের কারণ বোঝা যায়।

অ্যাসাইটিসের চিকিৎসা

- অ্যাসাইটিসের কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে তার চিকিৎসা করতে হয়।
- দিনে ৫.২ গ্রামের বেশি নুন না খেলে সিরোসিসের কারণে অ্যাসাইটিস হলে ফল পাওয়া যায়।
- ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় স্পাইরোনোল্যাক্টোন, ফ্রুসেমাইডের মতো মূত্রবর্ধকগুলিকে।
- পেটে অ্যাসাইটিসের তরলে চাপ খুব বেড়ে, শ্বাসকষ্ট হলে সুঁচ ফুটিয়ে তরল বার করে দেওয়াও চিকিৎসার অঙ্গ।
- কখনো কখনো অপারেশন করে অ্যাসাইটিসের তরল রক্ত-প্রবাহে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা বা শান্ট করা হয়।

অ্যাসাইটিসের জটিলতা

- মূত্রবর্ধক দিয়ে অ্যাসাইটিসের চিকিৎসা চলাকালীন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে।
- আপনা থেকে পেরিটোনিয়াল গহ্বরের ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত প্রদাহ হতে পারে অনেকের।

অ্যাসাইটিস রোগীর ভবিষ্যৎ

- যে সব সিরোসিস রোগীর অ্যাসাইটিস হয়, তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৫% এক বছরের মধ্যে মারা যান, পাঁচ বছর বেঁচে থাকেন ৪৪%।
- ক্যানসারের কারণে অ্যাসাইটিস হওয়ার মানে রোগ বেশ ছড়িয়েছে, এঁদের ভবিষ্যৎ ভালো নয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ জেনেরাল ফিজিশিয়ান। শ্রমজীবী মানুষের জন্য হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও উত্তরবঙ্গে চালানো কয়েকটি স্বাস্থ্যকর্মসূচিতে চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত।

প্রাথমিক শুশ্রূষা

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই

অধ্যায়-১

প্রাথমিক শুশ্রূষা বলতে কী বোঝায়?

কোনো দুর্ঘটনায় আহত বা হঠাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাথমিক এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও সাহায্য করাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা বলে, এইটি চিকিৎসক উপস্থিত হওয়ার পূর্ববর্তী সাহায্য।

প্রাথমিক শুশ্রূষার লক্ষ্য কী?

- জীবন বাঁচানো।
- দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি যাতে যথাসম্ভব কম সময়ে এবং সু-উপায়ে আরোগ্য লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- পরিস্থিতির আরও অবনতি যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা।
- আহত ব্যক্তি যাতে সময়মতো চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হন তার দ্রুত ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক শুশ্রূষা কে বা কারা দিতে পারে?

- যার প্রাথমিক শুশ্রূষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে।
- যিনি প্রকৃতই বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করতে চান।
- যিনি চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- যিনি বিপদের মধ্যে শান্ত থাকতে পারেন।

গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর কর্মপদ্ধতির একটি তালিকা দেওয়া হল।

- আহত ব্যক্তির পরীক্ষা এবং আঘাতের গুরুত্ব নির্ণয় করা।
- কার্ডিয়ো-পালমোনারি রিসার্টিটেশন-এর সঠিক প্রয়োগ।
- রক্তক্ষরণ প্রতিহত করা।
- শকের শুশ্রূষা করা এবং অজ্ঞান ব্যক্তির বিশেষ সেবা করা।
- ফ্র্যাকচার বা হাড়ে আঘাত থাকলে সেই স্থান যাতে নাড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।
- পুড়ে গিয়ে থাকলে সেই ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা করা।
- চোখ, কান আর নাকে আঘাত থাকলে তার শুশ্রূষা করা।
- অগভীর আঘাতের স্থানগুলির পরিচর্যা করা।
- দুর্ঘটনাগ্রস্তের দ্রুত স্থানান্তর করা।
- তাকে যথাযথ তথ্য সহকারে একজন চিকিৎসকের দায়িত্বে তুলে দেওয়া।

আহত ব্যক্তি যাতে সময়মতো চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হন তার দ্রুত ব্যবস্থা করা।

অধ্যায়-২

প্রাথমিক শুশ্রূষার বাক্সে কী থাকা উচিত?

- বিভিন্ন মাপের রোলার ব্যান্ডেজ।
- ছোটো, বড়ো গজের টুকরো।
- স্টেরিলাইজ করা ড্রেসিং।
- স্টেরিলাইজ করা তুলো।
- ছোটো কাঁচি।
- এক জোড়া ডিসপোসেবল্ গ্লাভস।
- ডেটল, স্যাভলন জাতীয় লোশন।
- অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম।
- ব্যথা নিরোধক ট্যাবলেট।
- অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ।
- ও আর এস।
- থার্মোমিটার।
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

অধ্যায়-৩

ভাইটাল সাইনস্

পালস্

- হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন দ্বারা মূল ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এর প্রভাব অন্যান্য ধমনি হয়ে প্রান্তিক ধমনিতে পরিলক্ষিত হওয়াকে ‘পালস্’ বলে।
- পালস্ মিনিটে কতবার হবে বা কতটা স্পষ্টভাবে তা বোঝা যাবে—সবটাই নির্ভর করে হৃদ্‌যন্ত্রে ‘হাটবিট’ কতবার হচ্ছে ও তাতে কতটা শক্তি আছে তার ওপর।

- পালস্ মাপার সহজতম পদ্ধতি হল কবজি (Radial) স্পর্শ করে অনুভব করা। তবে সবচেয়ে ভালো স্থান ঘাড়ের (Carotid) কাছে।
- প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ পালস্ রেট হওয়াব কথা। শিশুর ক্ষেত্রে এর হার কিছু বেশি। অস্বাভাবিক অতিরিক্ত ধীর লয়—মিনিটে ৫০টির কম। অতিরিক্ত দ্রুত লয় মিনিটে ১০০ টির বেশি। দুর্বল—শক, কার্ডিয়াক ফেলিয়োর ইত্যাদি কারণে কমে যাওয়া। জোড়ালো—রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া।

শ্বাসপ্রশ্বাস

- বুকের ওঠা-পড়া, নাক বা মুখ থেকে শ্বাস পড়ছে কি না নজর করুন।
- প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের হার মিনিটে ১৬ থেকে ২০টি। শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার কিছু বেশি হবে। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ও পালসের হার ১/৪ হওয়া উচিত। অস্বাভাবিক:
  অতি ধীর— মিনিটে ১২-র কম।
  অতি দ্রুত—মিনিটে ২০-র বেশি।
  অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ----বুকের ওঠা-পড়া কম, অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি যথেষ্ট অক্সিজেন গ্রহণ করছে না।

চোখের তারা

চোখ মস্তিষ্কের দ্বার। যদি মস্তিষ্কে আঘাত লাগে তার প্রতিফলন চোখের তারা লক্ষ করলে বোঝা যাবে। সেটির আকার স্বাভাবিকের তুলনায় ছোটো না বড়ো এবং আলো পড়লে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না তা লক্ষ করতে হবে। কোমা বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়:

- যদি দু-টি চোখের তারা সমানভাবে আচরণ করে—সে ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়নি।
- অসম আকৃতির দু-টি চোখের তারা বা দু-টি চোখের তারাই বড়ো—সে ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা।
- দু-টি চোখের তারাই সুচের মতো ছোটো—সে ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি বা কোনো বিষক্রিয়া থেকে হতে পারে।

শরীরের তাপমাত্রা

- অতিরিক্ত গরম—সংক্রমণ বা উত্তাপ থেকে জ্বর হতে পারে। ঠান্ডা করার চেষ্টা করুন।
- অতিরিক্ত ঠান্ডা—ডুবে যাওয়া বা বাইরে ঠান্ডায় পড়ে থাকার দরুন হতে পারে। শরীরে উত্তাপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।
- শক্, গুরুতর আঘাত, পুড়ো যাওয়া, রক্তপাত এই সব কারণে তাপমাত্রা পড়ে যেতে পারে।

ক্ষত

ক্ষত বলতে ত্বকের ধারাবাহিকতার ছেদ পড়াকে বোঝায়। এর থেকে দু-টি মূল বিপদের সম্ভাবনা থাকে: সংক্রমণ এবং রক্তপাত। সংক্রমণ রোধ করতে পরিষ্কার জল দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করুন যাতে ধুলো বা অন্যান্য বস্তু ক্ষতস্থান থেকে ধুয়ে যায়। আহত ব্যক্তিকে ছোঁয়ার আগে হাত ধোবেন কিন্তু মুছবেন না। ক্ষতস্থানে কোনো 'ফরেন মেটিরিয়াল' বা কাচের টুকরো থাকলে বের করে দিন। স্থানটি শুকনো করে স্টেরিলাইজড্ গজ বা নরম পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিন। তুলো দিয়ে ঢাকবেন না। সঠিক পদ্ধতিতে ব্যান্ডেজ করুন।

রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি প্রথমেই করতে হবে। ক্ষতস্থানের তুলনায় বড়ো একটি প্যাড দিয়ে স্থানটিকে ঢাকতে হবে। তার উপর সোজাসুজি চাপ দিন যতক্ষণ না রক্তপাত বন্ধ হয়। তারপরে ব্যান্ডেজ করুন। যদি রক্তপাত বন্ধ না হয় এবং প্যাড যদি রক্তে ভিজে যায় তবে তার ওপর আর একটি প্যাড দিতে হবে। যদি হাত বা পায়ে ক্ষত থাকে এবং কোনো হাড় না ভেঙে থাকে তাহলে হৃদ্‌যন্ত্রের থেকে উঁচুতে সেটিকে তুলে ধরুন। প্রয়োজনানুসারে ক্ষতস্থানের নিকটের ধমনির 'প্রেশার পয়েন্ট'-এ ১০ থেকে ১৫ মিনিট চাপ দিন। যদি বেশি রক্তপাত হয় তবে 'শক'-এর চিকিৎসা করতে হবে। আহত ব্যক্তিকে তরল বা 'ফ্লুইড' দিতে হবে। শরীরের কিছু স্থানে ধমনিকে হাড়ের ওপর চাপ দিয়ে রক্তপ্রবাহ রোধ করা যায়। এই স্থানগুলিকে 'প্রেশার পয়েন্ট' বলে। যদি ক্ষতস্থানে চাপ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ না করা যায় তবে এই জাতীয় কয়েকটি স্থানে চাপ দিয়ে রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 'প্রেশার পয়েন্ট' হল—ক্যারোটিড, সাবক্লেভিয়ান, ব্রাকিয়াল, রেডিয়াল, ফিমোরাল প্রেশাব পয়েন্ট।

হাড় ভাঙলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

- আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটির যাতে কোনোভাবে নড়াচড়া না হয় লক্ষ করুন। তার জন্য সঠিক স্প্লিন্ট ব্যবহার করুন। সেটি না থাকলে কাঠ, প্লাস্টিক, কার্ডবোর্ড, ছড়ি, ছাতা বা শক্ত বস্তু দিয়ে স্প্লিন্ট বানিয়ে নিন।
- স্প্লিন্ট আরামদায়ক করার জন্য তার ওপর যেকোনো নরম কাপড় ভাঁজ করে দিয়ে প্যাডিং করা উচিত।
- মেরুদণ্ডের ফ্র্যাকচার হলে আহত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করুন।
- আহত ব্যক্তিকে ধরে স্ট্রেচারে তুলবেন না। স্ট্রেচার পাশে রেখে তাকে ওর ওপর গড়িয়ে দিন। ব্যক্তিটিকে কাত করে স্ট্রেচারে তুলবেন।
- পাঁজরের ফ্র্যাকচার হলে আহত ব্যক্তিকে আঘাতের উলটোদিকে ভর দিয়ে শোয়ান। মাথা ও কাঁধ উপরের দিকে তুলুন। যেদিকে আঘাত সেই দিকে বাহুটিকে একটি স্লিং ব্যবহার করে ঝুলিয়ে রাখুন। আহত ব্যক্তিকে স্ট্রেচারে তুলে কম নড়াচড়া করে চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

হট স্ট্রোক বা সর্দিগর্মি হলে কী করবেন?

- যদি ব্যক্তিটির জ্ঞান থাকে তবে কোনো ছায়াযুক্ত বা শীতল স্থানে নিয়ে আসুন। কাপড় জামা সরিয়ে ঠান্ডা জলের ছিটে দিন। অথবা ব্যক্তিটিকে

ভিজে কাপড় দিয়ে মুড়ে পাখার তলায় রাখুন। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমে যাবে।

বিদ্যুতের শক লাগলে কী করণীয়?

- কোনো অবস্থাতে কোনো ব্যক্তি বিদ্যুতের তার স্পর্শ করে থাকলে বা কোনোভাবে শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তাকে ছোঁবেন না।
- সম্ভব হলে বিদ্যুতের উৎস বন্ধ করুন। সুইচ অফ্ করার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে আপনি একটি বিচ্ছিন্ন তল (Insulated Surface) যথা প্লাস্টিক বা রবারের সোল দেওয়া জুতো, কাঠের তক্তা, এমনকী খবরের কাগজের থাক বা শুকনো কিছুর ওপর থাকেন। আপনি নিজেও যেন শুকনো থাকেন। লাঠি দিয়ে সুইচ অফ্ করুন।
- যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর্টিফিসিয়াল ব্রিদিং-এর মাধ্যমে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করুন।
- প্রয়োজন হলে শক এবং পোড়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। যথা শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

মাথা এবং চোখে আঘাত

কখনো কখনো মাথায় আঘাতের লক্ষণগুলি সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়। কখনো কখনো আবার কয়েক ঘণ্টা পরে প্রকাশিত হয়। নীচের লক্ষণগুলি থাকলে ধরে নিন যে আহত ব্যক্তির আঘাত গুরুতর ও চিকিৎসার আশু প্রয়োজন:

- বিভ্রান্ত অবস্থা, ঝিমুনি ও জ্ঞান হারানো।
- শ্বাস যথেষ্ট সংখ্যার তুলনায় কম এবং রক্তচাপও কম।
- খিঁচুনি।
- মাথার খুলিতে ফ্র্যাকচার, মুখে আঘাতের দাগ, মাথায় ক্ষত।
- নাক, মুখ বা কান দিয়ে তরল পদার্থ নির্গত হওয়া।
- মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা।
- প্রথম দিকে উন্নতি হলেও পরবর্তী সময়ে অবস্থার অবনতি।
- কথা বা দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া।
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এবং বমি।
- হাত বা পা নাড়াতে না পারা।
- চোখের তারাতে বদল।
- শ্রবণ, দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কাজ না করা।

মাথায় আঘাত: প্রাথমিক শুশ্রূষা

আঘাত সামান্য হলে নির্দিষ্ট কিছু করার নেই। তবে আহত ব্যক্তির ওপর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে। যদি উল্লিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায় তবে শীঘ্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

চোখে আঘাতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শুশ্রূষা

- রাসায়নিক পদার্থ চোখের ভিতরে গেলে চোখে জলের ঝাপটা দিন।
- অন্য কোনো তরল পদার্থ বা চোখের ড্রপ ব্যবহার করবেন না।
- চোখে ফরেন বডি (বাইরের বস্তু) পড়লে চোখের পাতা ঘষবেন না।
- যদি বস্তুটি দেখা যায় তবে ভিজে কাপড়ের দ্বারা বস্তুটি বার করার চেষ্টা করুন। কাজ না হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অধ্যায়-৪

একজন আহত ব্যক্তিকে কীভাবে স্থানান্তর করব?

- আহত ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে যানবাহনে চলাচল করার ধকল নিতে পারবে কি না বুঝতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্থানান্তরের সময় পরিস্থিতির অবনতি না হয়।
- ব্যক্তিটিকে যে অবস্থায় যানবাহনে রাখা হবে সেটি যেন কোনো অবস্থাতেই মেরুদণ্ডে অবস্থিত স্পাইনাল কর্ডটি জখম না করে। তাকে যথাসম্ভব স্থির অবস্থায় রাখুন।
- আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং যাত্রাপথে কতটা সময় লাগবে এই কথাটিও মাথায় রাখতে হবে।
- মাথা ও ঘাড়ের অবস্থান যেন সঠিক হয়।
- স্থানান্তরটি দ্রুত এবং সময়কালীন শুশ্রূষা সহ নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই; এমবিবিএস, ডিপি এইচ, ডিজিএম (জেরিয়াট্রিক মেডিসিন)

একক মাত্রা

Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

শীতকালে ত্বকের সমস্যা

দামি বিদেশি ক্রিমের কোনো প্রয়োজন নেই, সামান্য সচেতন হলে, দৈনন্দিন শরীরের যত্নের দিকে একটু খেয়াল রাখলে খুব অল্প খরচেই শীতের ঠান্ডা শুষ্ক আবহাওয়ায় চামড়া ভালো রাখা যায় লিখেছেন—**ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

দুর্গাপুজো-কালীপুজো শেষ হতেই উত্তুরে হাওয়া বয়। গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়। শীত আসে। শীতের রংবেরঙের সবজি, মরশুমি ফুল আর পিকনিকের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে আসে খড়ি ওঠা শুকনো খসখসে চামড়ার অশান্তি। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দু-এক মাসের ঠান্ডা সবাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়। ইস! তার সঙ্গে যদি এই পা ফাটা শুকনো চামড়ার সমস্যাটা না থাকত!

কেন ত্বক শুকনো হয়?

চামড়ার উপরিভাগে যে কোষগুলো থাকে তা সবসময়ই তৈরি হচ্ছে আবার পরিণত হয়ে ঝরে সঙ্গে আমাদের অজান্তেই। আর প্রতিনিয়তই ত্বকের মাধ্যমে শরীরের জল কখনো অদৃশ্য ভাবে কখনো ঘাম হয়ে বেরিয়ে আবহাওয়ায় মিশছে। আবহাওয়ার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণের উপর এই জল নিষ্কাশন নির্ভর করে।

শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার পরিমাণ অতিরিক্ত কম থাকার জন্যে সহজেই কোষের জল বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে, আর তার জন্যই কত না সমস্যা।

কী কী করলে শীতকালে চামড়া বেশি ফাটে? কী করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়?

১. অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করলে এবং খুব বেশি সময় ধরে বার বার সাবান মাখলে। গায়েমাখা সাবানের pH মোটামুটি ৫.৫-এর কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. খুব বেশি গরমজলে স্নান করলে। শরীরের তাপমাত্রার সঙ্গে মানানসই উষ্ণ জলে চান করা উচিত।

৩. একটানা অনেকক্ষণ ধরে জল ঢেলে চান করলে। দশ মিনিটের বেশি সময় নিয়ে গায়ে জল ঢাকলে জলের সঙ্গে কোষের আর্দ্রতাও নষ্ট হয়। বারে বারে স্নান করলেও একই ভাবে ক্ষতি হয়।

৪. খুব বেশি রগড়ে চান করার অভ্যাস থাকলে। গামছা, ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে বেশি গরম জলে চামড়ার উপরিভাগের থেকে অপরিণত অবস্থাতেই ঝরে যায় আর স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়।

৫. খুব বেশি সময় এসি বা রুম হিটার যুক্ত ঘরে থাকলে।

৬. দীর্ঘসময় বাইরে রোদে থাকলে।

এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখলে চামড়ার কোষের জলে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা রোধ করা যায়।

চামড়ার উপরিভাগ একটু তৈলাক্ত রাখলে আর কোষের জল বেরোতে পারবে না—মসৃণ থাকবে ঠিক যেমনটি সব মানুষই চায়।

খুব কম খরচে শীতকালে যদি একটু খেয়াল করে দু-বার নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল মাখা যায়, অথবা ভেসলিন, তাহলেই ত্বক মসৃণ থাকে। ইউরিয়া বা প্যারাফিনযুক্ত ময়শ্চারাইজিং ক্রিমও ভালো কাজকরে।

শীতকালে কোন কোন চর্মরোগ বেশি বাড়ে?

শীতে কিছু কিছু চামড়ার রোগ বেড়ে যায়, তারা কষ্টও দেয় বেশি।

১. সোরিয়াসিস

এই দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগ যাদের আছে তাদের শীতকাল আসার আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। সোরিয়াসিসের যে খোসা ওঠা ব্যাপারটা থাকে তা শুষ্ক আবহাওয়ায় অনেক বেড়ে যায়। সোরিয়াসিস রোগীদের অনেক সময় শুধু নারকেল তেল বা অলিভ অয়েলে শুষ্কভাব কমে না, লিক্যুইড প্যারাফিন সম্পূর্ণ শরীরে মাখলে ভালো হয়।

খুব বেশি রগড়ে চান করার অভ্যাস থাকলে। গামছা, ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে বেশি গরম জলে চামড়ার উপরিভাগের থেকে অপরিণত অবস্থাতেই ঝরে যায় আর স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়।

২. অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস

যে সব শিশুদের অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস নামে চর্মরোগ থাকে তাদেরও ঠান্ডা পড়ার আগেই শিশুদের উপযুক্ত ময়শ্চারাইজিং ক্রিম মাখালে ভালো থাকে ত্বক।

৩. মীনচর্ম বা ইক্থাইওসিস নামে জন্মগত ও বংশগত একটি চর্মরোগ—যাদের থাকে তাদের চামড়া এতটাই শুকনো হয়ে যায় যে মাছের আঁশের মতো দেখতে লাগে। এই রোগীরা শীতকালে খুবই কষ্ট পায়। এদের তেল, ইউরিয়া যুক্ত ময়শ্চারাইজিং ক্রিম মাখা অত্যাবশ্যক। সেই সঙ্গে আছে ঢাকা জামাকাপড় পরা, বেশি সাবান ব্যবহার না করা।

৪. এছাড়া বয়স্ক মানুষ, হাইপোথাইরয়েড রোগী। এদেরও শীতকালে চামড়া অন্যদের চাইতে বেশি শুকনো হয়ে যায় বলে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। যাদের চামড়া অপেক্ষাকৃত বেশি তৈলাক্ত তারা ময়শ্চারাইজিং ক্রিমের বদলে লোশন ব্যবহারে করতে পারেন।

খুশকিও শীতকালে একটু বেশি হয়। তার জন্য উপযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। ঠোঁট ফাটার জন্য সামান্য ভেসলিন মাখলেই যথেষ্ট।

এইরকম ভাবে কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে শীতকালের ত্বকের সমস্যা অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে রাখা যাবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ভিভিডি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

জলাতঙ্কে আতঙ্ক নয়

প্রতিরোধে কী করব? চিকিৎসা কোন পথে চলবে?

জলাতঙ্ক রোগ হলে শতকরা ১০০ জন মানুষই মারা যান। অথচ কুকুর-বিড়াল, নেকড়ে, শেয়াল, হায়না ইত্যাদির কামড়ে জলাতঙ্কের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পরেও সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসায় এ রোগ ঠেকানো যায়। কিন্তু ডাক্তার থেকে জনসাধারণ সকলে এ ব্যাপারে উদাসীন। সেটার সঙ্গেও লড়ে জেতা যায়—লিখেছেন **সৌম্য সেনগুপ্ত**।

চিত্র ১. কুকুর ও কামড়ের পরিচিত ছবি

ঘটনা ১

গত ১১ আগস্ট ২০১৬ বাড়ির উঠোনে খেতে বসা আড়াই বছরের শিশু শুভজিৎ লোহারকে পাগল কুকুরে মারাত্মকভাবে কামড় দেয়। ডান হাতের কাঁধ ও কনুই-এর মাঝে ক্ষত ছিল গভীর। বাড়ির লোক সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রাধানগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এই ধরনের কামড় 'ক্যাটাগরি ৩' পর্যায়ে পড়ে। কুকুরে কামড়ালে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন (ARV-এআরভি) দিয়ে জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু এআরভি দিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা (অ্যান্টিবডি) শরীরে তৈরি হতে ৭ দিন সময় লাগে। তাই এরকম 'ক্যাটাগরি ৩' কামড়ের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় ক্ষতস্থান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে র‍্যাবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রয়োগ করে (এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।) রাধানগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ইমিউনোগ্লোবিউলিন না থাকায় শিশুটিকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে তাকে ভর্তি নিয়ে নেওয়া হয়। রাত অবধি টিটেনাস টক্সয়েড ছাড়া আর কোনো ওষুধ না পাওয়ায় শিশুটির মা রাতে যে ডাক্তার দেখতে এসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—কুকুরে কামড়ের ইঞ্জেকশন কখন দেওয়া হবে? তা শুনে চিকিৎসক বলেন—পরদিন আউটডোর থেকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে। তিনি ক্ষতস্থানে লাগাবার জন্য মেট্রোনিডাজোল এবং পভিডন

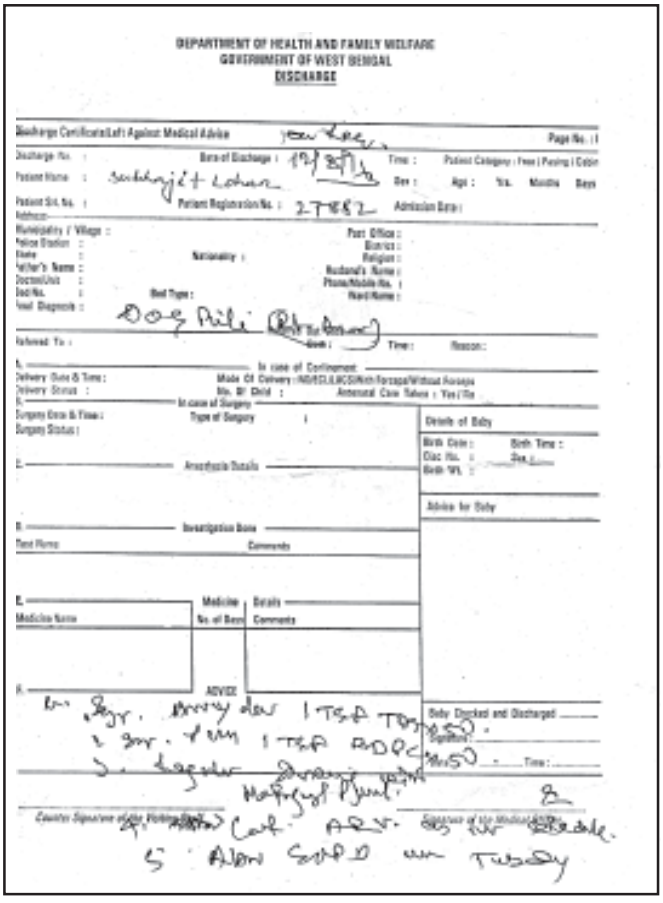

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DISCHARGE

চিত্র ২. বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের ইনডোর থেকে ছাড়ার সময়ে দেওয়া ডিসচার্জ সার্টিফিকেট

আয়োডিন-এর মিশ্রণ মলম লিখে দেন। জলাতঙ্ক প্রতিরোধে এইসব এই সময়ে মলম বা টিটেনাস ইঞ্জেকশনের কোনো ভূমিকা নেই।

পরদিন আউটডোরে টিকিট কেটে ডাক্তার দেখালে ডাক্তার অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাক্সিনের ডোজ শুরু করেন, এবং বাকি ডোজগুলি যে যে দিনে নিতে বলেন তা ছিল ভুল। তিনি লেখেন D0, D1, D3 & D28। এর অর্থ ইঞ্জেকশন দেবার দিনগুলো হল উক্ত দিন D0, ১ দিন পর অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পর D1, তৃতীয় দিনের মাথায় D3—এইরকম। কিন্তু নিয়ম অনুসারে D0, D3, D7, D14 ও D28 দিনে ইঞ্জেকশন দেবার কথা। অবশ্য ফার্মাসিস্ট ঠিক তারিখ অনুযায়ী রোগীকে আসতে পরামর্শ দেন।

ঘটনাটি আমরা জানতে পারি ১৭ আগস্ট ২০১৬। জেনেই আমরা ক্ষতস্থানের ছবিসহ বিষয়টি জানিয়ে 'স্নেক বাইট ইন্টারেস্ট গ্রুপ' নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চিকিৎসকদের পরামর্শ চাই। ওঁরা পুনরায় শুভজিৎকে নিয়ে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। সেখানে নিয়ে গেলে হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দেবার ব্যবস্থা করেন।

সহযোগিতার জন্য সুপারিনটেন্ডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির রাধানগর শাখার পক্ষ থেকে আমরা ওনার কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনে নীচের প্রশ্নগুলি রাখি—

১. কোন চিকিৎসক শুভজিৎ-এর চিকিৎসা করেছিলেন? তাঁর নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর কত?
২. কেন ১১ তারিখের পরিবর্তে ১২ তারিখ শুভজিৎকে এআরভি দেওয়া হল? শুভজিৎ তো ১১ তারিখেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।
৩. শুভজিৎ-এর ক্ষতস্থানে কেন ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি?
৪. রাধানগর হাসপাতাল থেকে আপনাদের হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল তাতে রেফার-এর কারণ হিসাবে কী লেখা ছিল?

এমন ভুল করা থেকে চিকিৎসকরা যাতে বিরত থাকেন তার জন্যই আমাদের এই পদক্ষেপ।

ঘটনা ২

গত জুন মাসের কোনো এক শুক্রবার সুমন সরেন নামে এক ১৫ বছরের বালককে কুকুরে কামড়ায়। রাধানগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে চিকিৎসক পরের সোমবার হাসপাতালে এসে এআরভি ইঞ্জেকশন শুরু করার কথা বলেন। National Guidelines for Rabies Prophylaxis and Intra-Dermal Administration of Cell Culture Rabies Vaccines-2007-এ কিন্তু দরকার হলে তৎক্ষণাৎ এআরভি শুরুর কথা বলা আছে।

এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে কাউকে যেকোনো সময় যেতে হতে পারে, সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে নিজেকেই এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তাই আসুন আমরা একটু জেনে বুঝে নিই কুকুরে কামড়ালে কী করব আর কী করব না। কোন পথে চলবে আমাদের চিকিৎসা?

বিবিসি: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-র তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৫৯,০০০ মানুষ র‍্যাবিস ভাইরাস সংক্রমণে ঘটা জলাতঙ্ক রোগে মারা যান, যার মধ্যে ভারতবর্ষেই মারা যান প্রায় ২০,৮০০ জন। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট মৃত্যুর প্রায় ১/৩ অংশ ঘটে ভারতে। এবং জলাতঙ্কে মৃত্যু ভয়ংকর কষ্টকর মৃত্যু। এই রোগ হলে রোগ সারানো যায় না, কিন্তু ভাইরাস শরীরে ঢোকার পরেও রোগ হওয়া প্রতিরোধ করা যায়। কীভাবে? তার আগে রোগটা সম্বন্ধে একটু জেনে নিই।

কাদের জলাতঙ্ক হয়? কীভাবে ছড়ায়

জলাতঙ্ক 'গরম রক্তের' প্রাণীদের হয় ও এদের লালার মাধ্যমে র‍্যাবিস ভাইরাস (যা জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু) ছড়ায়। সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম এমন আক্রান্ত প্রাণীর লালার সঙ্গে অন্য প্রাণীর রক্তের বা শরীরের শ্লেষ্মাঝিল্লির (মিউকাস মেমব্রেন, যথা মুখের ভেতরকার আবরণী) সংযোগের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে কুকুরের কামড় থেকে এই রোগ হয়। র‍্যাবিস ভাইরাস আক্রমণকারী প্রাণীর লালারস বাহিত হয়ে আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে ঢুকে স্নায়ু বেয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে ও মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এবং শেষ পরিণতিতে এনসেফালাইটিস, অথবা প্যারালাইসিস (পক্ষাঘাত), কোমা, ঘটায়। এই রোগ হলে রোগীর জল খেতে কষ্ট হয়, তারপর শেষ অবস্থায় জল দেখলেই অসহ্য কষ্ট হয়—তাই এর বাংলা নাম জলাতঙ্ক।

কীভাবে রোগকে প্রতিরোধ করা যায়

ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করতে কিছুটা সময় নেয়। তার মধ্যে শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (অ্যান্টিবডি) গড়ে তুলতে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। ভ্যাক্সিন দিলে শরীর নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ অ্যান্টিবডি ইত্যাদি তৈরি করে, ও র‍্যাবিস ভাইরাসকে মেরে ফেলে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে বেশি মাত্রায় ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করার সময় না পেতেও পারে, তার আগেই জলাতঙ্ক রোগ শুরু হয়ে যেতে পারে। একবার জলাতঙ্ক রোগ শুরু হয়ে গেলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। ঠিক কী কী ধরনের ক্ষত হলে বেশি মাত্রায় ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারে, তার একটা সুনির্দিষ্ট তালিকা আছে, পরের পৃষ্ঠার সারণিতে সেই তালিকা দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবুরা সেই তালিকা অনুসারে তীব্র ক্ষত হলে র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন-এর সঙ্গে রেডিমেড অ্যান্টিবডি প্রয়োগ করেন। ক্ষতস্থানে এবং পেশিতে এই 'রেডিমেড অ্যান্টিবডি' বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা আবার আসব। আপাতত র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন নিয়ে কিছু কথা বলি।

এআরভি-র ডোজ ও প্রকারভেদ

এই ভ্যাক্সিন দুই ধরনের। ১. IM (ইন্ট্রা-মাস্কুলার-অর্থাৎ পেশিতে)—মোট ৫টি ডোজ D0, D3, D7, D14, D28। ২. ID (ইন্ট্রা-ডারমাল অর্থাৎ চামড়ায়)—মোট ৪টি ডোজ D0, D3, D7, D28—প্রতিবার একসঙ্গে দু-টি জায়গায় ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। D0-এর অর্থ-শূন্যতম দিন—সাধারণভাবে যেদিন কুকুর বা অন্য পশু কামড়ে-আঁচড়ে দিল সেইদিনকে D0 ধরা হয়। যেমন—২রা জানুয়ারি কাউকে কুকুরে কামড়ালে পেশিতে দেওয়ার ভ্যাক্সিন দেওয়া হবে ২ জানুয়ারি, ৫ জানুয়ারি, ৯ জানুয়ারি, ১৬ জানুয়ারি ও ৩০ জানুয়ারি। কিন্তু তাকেই চামড়ায় দেওয়ার ভ্যাক্সিন দিলে তা দেওয়া হবে ২ জানুয়ারি, ৫ জানুয়ারি, ৯ জানুয়ারি ও ৩০ জানুয়ারি।

কখন চিকিৎসা শুরু হবে

কুকুর, বিড়াল বা অন্যান্য বন্য জন্তু মানুষকে কামড়ালে প্রাণীটিকে র‍্যাবিস আক্রান্ত প্রাণী সন্দেহ করতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করতে হবে। যেহেতু জলাতঙ্ক হলে মৃত্যু ১০০% নিশ্চিত তাই কুকুর বা বিড়াল কামড়ালে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে 'মেডিক্যাল এমার্জেন্সি' হিসাবে ধরে তার জীবনদায়ী চিকিৎসা দেবেন।

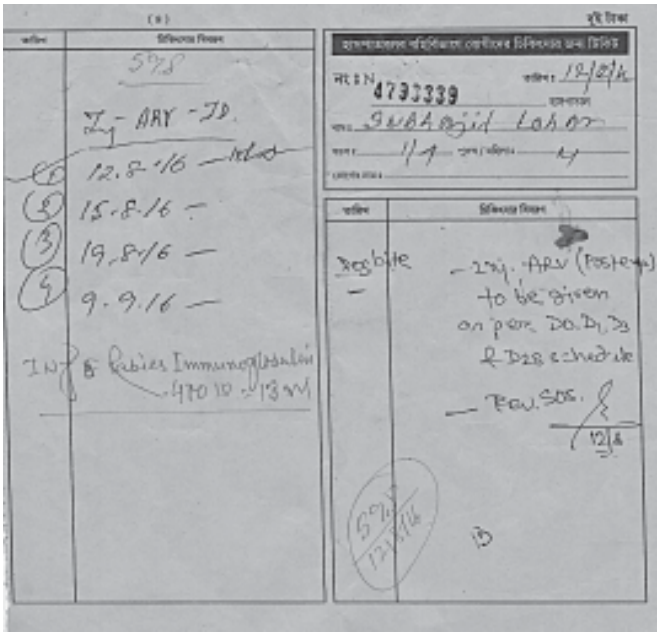

চিত্র ৩. বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের আউটডোর টিকিট। ডানদিকে ডাক্তারের ভুল পরামর্শ, বাঁ-দিকে প্রায় সঠিক চিকিৎসার রেকর্ড

কামড় দেওয়া প্রাণীর প্রতি কত দিন নজর রাখতে হবে

১০ দিন। কিন্তু তা কেবল কুকুর বা বেড়ালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই রোগের চরিত্র বোঝা যায়নি। তাই সেক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটবে না।

১০ দিন নজর রেখে কী বোঝা যাবে

যদি ১০ দিন ধরে নজর রেখে প্রাণীটিকে সুস্থ দেখা যায় তাহলে পেশিতে দেওয়া এআরভি ভ্যাক্সিন-এর D14টি শুধু বাদ যাবে। চামড়ায় দেওয়া ভ্যাক্সিন-এর ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না।

ভ্যাক্সিন দেওয়া প্রাণীর ক্ষেত্রে

ভ্যাক্সিন দেওয়া থাকলেও প্রাণীটি র‍্যাবিড হতে পারে। তার নানা কারণ হতে পারে—যেমন সঠিকভাবে ভ্যাক্সিন না দেওয়া, খারাপ মানের ভ্যাক্সিন, প্রাণীর দুর্বল স্বাস্থ্য, সর্বোপরি একটি ভ্যাক্সিনের দীর্ঘদিন নিরাপত্তা না দেওয়া ইত্যাদি। তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে কামড় দেওয়া প্রাণীটির ভ্যাক্সিন দেবার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কামড়ের পরের চিকিৎসা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পালটাতে পারে।

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কামড়—চিকিৎসা কি একই

হ্যাঁ, দু-ক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করতে হবে। কারণ প্রাণীটি ইচ্ছে করে কামড়ায়নি মানে এই নয় যে প্রাণীটি র‍্যাবিড নয়।

বন্য জন্তু কামড়ালে? বাদুড়ের কামড় থেকে

বনে বা জঙ্গলে যেকোনো জন্তু কামড়ালে তা 'ক্যাটাগরি ৩' কামড় ধরে চিকিৎসা করতে হবে।

ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যাদের সামনের দাঁত শক্ত, যেমন ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি জন্তু যারা মাটিতে গর্ত করে বসবাস করে তাদের কামড়ের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা লাগে না। বাদুড় থেকে জলাতঙ্ক সংক্রমণের ঘটনা ভারতে ঘটে না—এক্ষেত্রে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রের পরামর্শ নিতে হবে।

কম রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতাযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে

কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল থাকে। আবার বিশেষ ওষুধে আছেন, যেমন—ক্যানসারের কেমোথেরাপি চলছে, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ওষুধে আছেন, বা ক্যানসারে ভুগছেন—এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় 'ক্যাটাগরি ২' বা 'ক্যাটাগরি ৩' কামড়ের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ক্ষতস্থানে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিয়ে চিকিৎসা এবং পেশিতে নেওয়ার এআরভি-র পুরো ডোজ শেষ হওয়ার পর ১৪ দিনের মাথায় ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টির‍্যাবিজ অ্যান্টিবডির মাত্রা মাপা জরুরি।

যেসব ব্যক্তি ম্যালেরিয়া ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য 'ক্লোরোকুইন' ওষুধ খাচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রে পেশিতে নেওয়া এআরভি দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

মানুষ থেকে মানুষে কি এই রোগ ছড়ায়

মানুষ থেকে মানুষে এই রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি প্রায় নেই। এবং এই বিষয়ে খুব প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি জলাতঙ্ক ব্যক্তির লালারসের সংস্পর্শে আসেন সেক্ষেত্রে তাঁকেও কামড় বলে ধরে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে।

অঙ্গ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কী বিধিনিষেধ আছে

জলাতঙ্ক আক্রান্ত ব্যক্তি বা জলাতঙ্ক হতে পারে সন্দেহ আছে এমন ব্যক্তির শরীর থেকে অঙ্গ অন্য মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপিত করা যায় না।

কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, তাই বলে কি এই চিকিৎসা দেওয়া বারণ

না। যেহেতু এই রোগ হলে ১০০ শতাংশ মানুষ মারা যান তাই সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পূর্ণ চিকিৎসা দিতে হবে। যেমন—গর্ভাবস্থা, স্তন্যদায়ী মা, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রেই দরকারে এই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার এআরভি গর্ভবতী মা, গর্ভের শিশু, স্তন্যদায়ী মা—এদের সকলের ক্ষেত্রেই আর পাঁচটা মানুষের চাইতে বেশি ক্ষতিকর এমন প্রমাণ নেই। সাপের কামড়ে ব্যবহৃত এভিএস-এর ক্ষেত্রেও এই নিরাপত্তার বিষয়টি সত্য।

ভ্যাক্সিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা

অন্যান্য ভ্যাক্সিনের মতোই এই ভ্যাক্সিন দেওয়ার পর অন্ততপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা জরুরি।

ভ্যাক্সিন ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিয়ে রোগ প্রতিরোধের জন্য কীরকম সময় পাওয়া যায়

আমরা জানি ভাইরাস স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করলে তবেই রোগ হয়। ভাইরাসের শরীরে ঢুকে স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করতে যে সময় লাগে তা নানা ক্ষেত্রে কম বেশি হতে পারে। তাই সুস্থ মানুষ ভাইরাসের সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে। কিন্তু কখনো যদি কোনো ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য দেরিতে আসেন, এমনকী ১ মাস বা ১ বছর পরে এলেও, কামড় তথা র‍্যাবিস সংক্রমণ ইদানিং ঘটেছে ধরে নিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই চিকিৎসক যতদূর সম্ভব তা যাচাই করে নেবেন।

র‍্যাবিস সংক্রমণের ঝুঁকি যাচাই করা বেশ জটিল এবং বিভ্রান্তিকর। তাই কোনো সন্দেহ থাকলে কামড় ধরে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করে তারপর চিকিৎসক প্রয়োজনে অ্যান্টির‍্যাবিস সেন্টারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

আঁচড় বা কামড়ের পর জলাতঙ্কের টিকা দেবার নির্দেশিকা

বর্গ	সংস্পর্শের ধরন	সুপারিশ
I.	পশুকে খাওয়ানো বা ছোঁয়া। অক্ষত চামড়ায় চেটে দেওয়া। অক্ষত চামড়ায় জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী বা মানুষের শরীরের দেহরসের সংস্পর্শে আসা।	কিছু করতে হবে না, যদি বিশ্বস্ত তথ্য সূত্র পাওয়া যায়।
II.	খোলা চামড়ায় অল্প কামড়, অল্প আঁচড় যাতে রক্তপাত ঘটেনি।	সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করুন। এআরভি দেবার ব্যবস্থা করুন। (বিশেষ ক্ষেত্রে—স্বল্প প্রতিরোধ ক্ষমতা যুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং এআরভি, পেশিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে)।
III.	এক বা একাধিক চামড়া ছিঁড়ে ফেলা কামড় অথবা আঁচড়। ক্ষত আছে এমন চামড়ায় চেটে ফেলা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে চেটে ফেলা।	ক্ষত স্থানের যত্ন নেওয়া। ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন। এআরভি ভ্যাক্সিন।

চিকিৎসার তিনটি পর্যায়, যার প্রতিটি ধাপ সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্পর্শের ধরন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে করে যেতে হবে। এই তিনটি ধাপ হল ক্ষত পরিষ্কার করা, জলাতঙ্কের টিকা (এআরভি) দেওয়া ও ক্ষেত্র বিশেষে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া।

ক্ষত পরিষ্কার করা

ক্ষতস্থান জল এবং সাবান দিয়ে পর্যায়ক্রমে ধুতে হবে। বার বার অনেকক্ষণ ধরে ধুতে হবে। এমনকী রোগী অনেক পরে এলেও ক্ষতস্থান যদি শুকিয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে এই ধোয়ার কাজ করতে হবে।

ক্ষতস্থান পরিষ্কারের ধাপগুলি

করণীয়	কীভাবে	উদ্দেশ্য
ভৌত	কলের তলায় বা ওপর থেকে পরিষ্কার জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে।	ভাইরাসকে যতদূর সম্ভব ক্ষতস্থান থেকে ধুয়ে বের করে ফেলা।
রাসায়নিক	ক্ষতস্থান সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তারপর পভিডন আয়োডিন বা অ্যালকোহল জাতীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগ করুন।	ভাইরাসকে অকেজো করা।
জৈবিক	ক্ষতস্থানের মধ্যে গভীরে এবং ক্ষতের চারপাশে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিন।	ক্ষতস্থানের মধ্যে থাকা ভাইরাসকে প্রশমিত করা।

ক্ষত পরিষ্কারের সময় কী করা যাবে না

১. খালি হাতে ক্ষত পরিষ্কার করবেন না।

২. ক্ষতের মধ্যে চুন, হলুদ, তেল, গাছগাছড়ার রস, গঁদ, গাছের পাতা, মাটি, চক, ইত্যাদি কোনো ধরনের টোটকা প্রয়োগ করবেন না। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে এই সব বস্তু লাগানো থাকে তাহলে তা সাবধানে ও আলতোভাবে জল ঢেলে সাবান সহযোগে পরিষ্কার করতে হবে।

যদি সাবান না থাকে? কল না থাকে?

যদি সাবান না পাওয়া যায় তাহলে জল ঢালুন ও ক্রমাগত ধুতে থাকুন। যদি জলের কল না থাকে তবে মগে করে জল নিয়ে ওপর থেকে ঢালতে হবে। যত শীঘ্র ধুতে পারবেন ধোয়ার ফললাভ তত বেশি হবে। তাই সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ধোয়ার সুবিধা থাকা জরুরি।

ক্ষতস্থানে সেলাই

ক্ষতস্থানে সেলাই করার ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। সেলাই না করলে যদি তা রোগীর পক্ষে প্রাণঘাতী হয়, যেমন—রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, এমন ক্ষেত্রে ক্ষতস্থান ভালো করে ধুয়ে, ক্ষতস্থানের গভীরে এবং ধারে ধারে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে সংখ্যায় যত কম সম্ভব আলগা সেলাই দিতে হবে। এই দেরি করার ফলে ক্ষতস্থানের কলার মধ্যে অ্যান্টিবডি ঢুকতে পারে।

ক্ষতস্থান কী পোড়ানো (কটারাইজেশন) যাবে?

এতে চামড়ায় বাজে দাগ তৈরি হয় এবং জল ও সাবান দিয়ে ধোয়ার থেকে বেশি কোনো লাভ পাওয়া যায় না।

টিটেনাস ও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা

টিটেনাস দরকারে দিতে হবে। ক্ষতে সংক্রমণ আটকাতে অ্যান্টিবায়োটিকের পূর্ণ কোর্স দিতে হতে পারে।

রেবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিয়ে চিকিৎসা

কাদের লাগবে

ক্যাটাগরি III কামড়ের ক্ষেত্রে ও শরীরে আভ্যন্তরীণ রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা কম এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি II ও III কামড়ের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

মাত্রা

(ERIG-Equine Rabies Immunoglobulin-এর মাত্রা ৪০ IU প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য।) যেমন—কোনো শিশুর ওজন ২০ কিলোগ্রাম হলে, তাকে ৮০০ IU ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিতে হবে। এবং HRIG-Human Rabies Immunoglobulin-এর মাত্রা ২০ IU প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য), প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মাত্রায় ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিলে তা এআরভি-এর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। তাই সঠিক মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু আপনার জন্য খুললে ওষুধটা নষ্ট হবে।' এই অজুহাতে কামড়ের দিনে এআরভি না দিয়ে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে যদি এআরভি দেওয়া হয়, তাহলে তার তীব্র প্রতিবাদ করুন। এআরভি-র একটা ভায়ালের থেকে মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি।

ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেবার পদ্ধতি

- ফ্রিজ থেকে বের করে ঘরের তাপমাত্রায় এনে (২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শরীরে প্রয়োগ করতে হবে।
- ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেবার আগে স্কিন টেস্ট করার দরকার নেই।
- যতদূর সম্ভব ক্ষতস্থান এবং তা চারপাশে দিতে হবে, বারবার ছুঁচ ফোটানো এড়াতে হবে এবং অবশিষ্ট থাকলে তা পেশির মধ্যে গভীরে প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষতস্থান যদি অনেকটা জায়গা জুড়ে হয় সেক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিউলিন পুরো ক্ষতস্থান জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে হিসাব করে নেওয়া ইমিউনোগ্লোবিউলিন-এর সঙ্গে নরম্যাল স্যালাইন মিশিয়ে লঘু করে পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে পুরো ক্ষতস্থান জুড়ে দিতে হবে।
- একই সিরিঞ্জে এআরভি ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া যাবে না। শরীরে ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেবার স্থান এআরভি দেবার স্থান থেকে দূর হবে।
- ইমিউনোগ্লোবিউলিন কখনোই শিরায় দেওয়া যাবে না।

কামড়ের কতক্ষণের মধ্যে ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া যাবে

প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইমিউনোগ্লোবিউলিন কামড়ানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, প্রথম (D0) ডোজের এআরভি-র সঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু কোনো কারণে তা পাওয়া না গেলে প্রথম এআরভি দেওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া যায় (অর্থাৎ ৩ নং এআরভি-র ডোজের আগে অবধি দেওয়া যায়। খেয়াল করুন প্রথম ঘটনায় শুভজিৎ-কে ১১ আগস্ট কামড়ালেও ১৭ তারিখে ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া হয়—এমন হবার কথা নয়।

আসুন সকলে মিলে প্রতিরোধ করি জলাতঙ্ককে। ঘটনা ২-এর সূত্র ধরে বলি কোনো হাসপাতালে দেখতেই পারেন যে কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা নিতে গেলে বলছে—'আপনার এআরভি লাগবে, কিন্তু একজনের জন্য দামি ওষুধ নষ্ট করব? সোমবার আসবেন ওই দিন আরও পাঁচজন আসবে, তখন একসঙ্গে ওষুধটা খুলব, শুধু আপনার জন্য খুললে ওষুধটা নষ্ট হবে।' এই অজুহাতে কামড়ের দিনে এআরভি না দিয়ে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে যদি এআরভি দেওয়া হয়, তাহলে তার তীব্র প্রতিবাদ করুন। এআরভি-র একটা ভায়ালের থেকে মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন এআরভি দেওয়া হলে প্রতিদিনই একাধিক রোগী আসতে পারেন।

একটা ভালো খবর দিচ্ছি—এই মুহূর্তে রাধানগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীর দরকারে প্রতিদিনই অ্যান্টিরেবিস ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। প্রতিদিন এআরভি-র সঙ্গে সমস্ত ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতে প্রতিদিন ইমিউনো-গ্লোবিউলিন দেবার ব্যবস্থা থাকে তার দাবি তুলতেই হবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক শিক্ষক ও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কর্মী।

Advt.

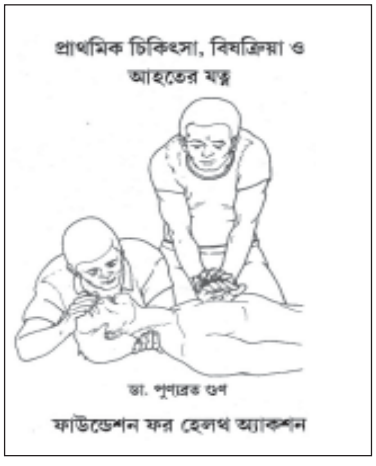

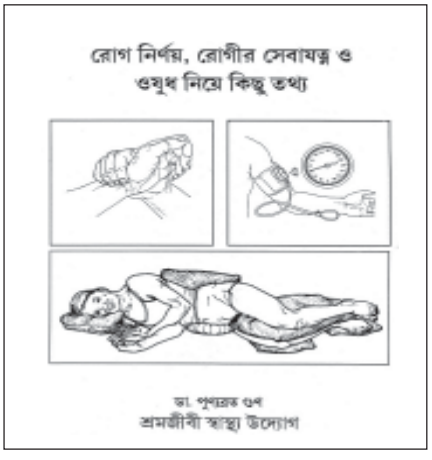

স্যালাইনের ব্যবহার ও অপব্যবহার

শিরা ফুঁড়ে যেকোনো দ্রবণ দেওয়াকে চলতি ভাষায় আমরা বলি 'স্যালাইন দেওয়া'। সেটা বেশি দিলে বিপদ, আবার বিপদ যথাসময়ে না দিলেও—লিখেছেন **ডা. মৃন্ময়**।

স্যালাইন বলতে এখানে সাধারণ লবণজল অর্থাৎ নরম্যাল স্যালাইনের (NS) পাশাপাশি অন্যান্য দ্রবণ যেমন—বেশি আয়নযুক্ত দ্রবণ, বিভিন্ন মাত্রায় গ্লুকোজ দ্রবণ, ল্যাকটেট দ্রবণ বা প্রোটিন জাতীয় দ্রবণ সবগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্যালাইন বলতে সাধারণ লবণ দ্রবণ বা ০.৯% নরম্যাল স্যালাইন বোঝালেও, সাধারণ মানুষ স্যালাইন বলতে পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত দ্রবণকেই বোঝেন।

ঘটনা ১

সদ্য ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করে প্রশিক্ষণ পর্বের প্রথম দিকের কথা, জীবনের প্রথম ডিউটি দিতে গেছি জরুরি অর্থাৎ এমার্জেন্সি বিভাগে, ভয়ে ভয়ে, কীভাবে কী করব তা কিছুই জানি না। প্রায় ১ ঘণ্টার মাথায় একটি স্ট্রেচারে করে এক মধ্যবয়স্ক লোক প্রায় আধমরা অবস্থায় এলেন। জীবনের তৃতীয় রোগী, রোগীর তিন হাত দূরত্বে পৌঁছোতেই একজন মহিলা, অগোছালো শাড়ি-পরা, এলোমেলো চুল, হাঁউ-মাউ করে কেঁদে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। কিছু বোঝার আগেই তিনি হাতজোড় করে আমাকে সোজা ভগবানের আসনে বসিয়ে দিলেন। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা, খানিকটা ছিটকে গিয়ে বললাম 'এ কী করছেন? আমি তো আপনার ছেলের বয়সি।' মহিলার প্রত্যুত্তর: 'ডাক্তার তো ভগবানই, তা সে যে বয়সেরই হোক না কেন, আমার স্বামীকে দয়া করে বাঁচান ডাক্তারবাবু . . .।' এ দিকে জীবনের প্রথম আধমরা রোগীকে দেখে আমার হৃদ্‌স্পন্দন তখন মিনিটে ১২০ দাঁড়িয়েছে, কী করে কী করব ভেবে ঘামতে শুরু করেছি। তা যাই হোক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে এমন অবস্থা হল?' চোখের জল মুছে মহিলার উত্তর: 'কাল রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সকালে এক ড্রেনের ধারে পড়েছিল। পাড়ার পাঁচু দেখে খবর দেয়। কিছুই জানি না ডাক্তারবাবু, কথাও বলতে পারছে না। সকালে তাও আবোল তাবোল বকছিল। এখন তো . . .' আবার মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন।

রোগীর পাশে গিয়ে নাম শুধোলাম—কোনো সাড়া নেই। বুকের হাড়ে হাত ঘষে চাপ দিতে গোঙানির শব্দ। নাড়ি অর্থাৎ পালস্ এবং রক্তচাপ সবই ঠিক আছে, পড়লাম মহা মুশকিলে। অগত্যা রোগীর বিবরণ নিয়ে আমার উপরের পদের ভগবান (অর্থাৎ পিজিটি)-এর দ্বারস্থ হলাম। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীকে দেখলেন আর মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদ খায় তো?' মহিলার জবাব: 'মদেই তো ডুবে থাকে ডাক্তারবাবু।'

ফের প্রশ্ন: 'সুগার আছে?'

মহিলার উত্তর : 'হ্যাঁ, আছে ডাক্তারবাবু। কিন্তু আমি তো নিজের হাতে রোজ নিয়ম করে হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ খাওয়াই। ডাক্তারবাবু আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। আমার তিনটে মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব ওর কিছু হলে . . .' অঝোরে কাঁদতে থাকেন মহিলা।

দাদা আমাকে বললেন রক্তের গ্লুকোজ অর্থাৎ C.B.G. (ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ) দেখতে। CBG দেখতে গিয়ে দেখি রোগীর রক্তের গ্লুকোজ ২৭ অর্থাৎ রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা খুব কমে গেছে----যাকে বলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। হঠাৎ যেন আগুন লেগে যাওয়ার মতো হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল জরুরি বিভাগের ওই কোণটাতে। তাড়াতাড়ি আমি আর

আমরা হয়ে গেলাম মহিলার কাছে জাদুকর, আর আমাদের জাদুর কাঠি যেন ওই গ্লুকোজের স্যালাইনের ৪টি বোতল।

দাদা 'চ্যানেল করে' শিরা দিয়ে ২৫ শতাংশ গ্লুকোজের দ্রবণ দেওয়া শুরু করলাম। আধ ঘণ্টায় রোগী নাম বলতে শুরু করল। ঘণ্টা চারেক পর রোগী রীতিমতো নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ি গেল। আমরা হয়ে গেলাম মহিলার কাছে জাদুকর, আর আমাদের জাদুর কাঠি যেন ওই গ্লুকোজের স্যালাইনের ৪টি বোতল।

[প্রসঙ্গত: রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। এমত অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তে গ্লুকোজ পৌঁছানো দরকার ছিল শিরা দিয়ে। এই ব্যবস্থায় রোগীর যেকোনো সময় খিঁচুনি হতে পারত। রোগী কোমায় চলে যেতে পারত বা মৃত্যুও হতে পারত।]

ঘটনা ২

তা প্রায় প্রশিক্ষণ পর্বের ৬ মাস পেরিয়ে গিয়েছে, এখন আর অজ্ঞান অথবা আধমরা রোগী দেখলে হৃদ্‌স্পন্দন ১০০ পার হয় না বা ঘামতে শুরু করি

না। অনেকটাই পরিণত। আবার সেই জরুরি বিভাগে ডিউটি। এক বন্ধুর কাজ থাকার দরুন তার পরিবর্তে গেছি ডিউটি দিতে। রাত্রি তখন আড়াইটা মতো হবে। এমন সময় এক মহিলা এলেন প্রায় পায়ে হেঁটেই। পোশাক-আশাকে উচ্চ মধ্যবিত্তের ছোঁয়া, সঙ্গে ৫-৬ জন বাড়ির লোক, সকলেই হুড়মুড় করে জরুরি বিভাগে ঢুকে রীতিমতো শোরগোল পাকাতে শুরু করে দিয়েছে, কেউ সিস্টার তো কেউ ডক্টর বলে ডাক পাড়ছে, তো কেউ ফোন নিয়ে মহা ব্যস্ততায় মত্ত। গিয়ে রোগীণীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী অসুবিধে হচ্ছে আপনার?' সঙ্গে সঙ্গে রোগীণী ও বাড়ির তিনজন সদস্য মিলে এমনভাবে সমস্যার বর্ণনা দিতে শুরু করল যে তা হ-য-ব-র-ল হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা খানিক বিরক্তির সুরে বললাম, 'উনি কি বোবা নাকি? বেশ তো কথা বলছেন। ওঁর অসুবিধের কথা ওঁকেই বলতে দিন না। যদি দরকার পড়ে তখন জিজ্ঞাসা করব আপনাদের। আর ১ জন বাড়ির লোক ছাড়া বাকি সকলে বাইরে যান।' তারপর রোগীণীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী অসুবিধে হচ্ছে?' 'রোগীণী খানিকটা ক্লান্ত চোখে-মুখে উত্তর দিলেন: 'সন্ধ্যে থেকে ৪ বার পাতলা পায়খানা ও ১ বার বমি হয়েছে।' পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখলাম রোগীণীর তেমন কোনো সমস্যাই নেই যা আপৎকালীন। সমস্ত রকম গুরুত্বপূর্ণ সূচক যেমন নাড়ি, প্রেশার, রক্তের গ্লুকোজ, শ্বাসের হার ঠিক পরিসরেই আছে। অগত্যা একটি টিকিট করে তাঁকে মুখে খাবার ওআরএস (ORS) ও সাধারণ খাবারদাবারের পরামর্শ দিলাম। সঙ্গে একটি বমির ওষুধও লিখে দিলাম। বললাম, 'যদি খুব বেশি বমি হয় তবেই খাবেন। না হলে খাওয়ার দরকার নেই। ওআরএস ঠিক মতো খান, তাহলেই হবে। যদি না কমে তবে পরে বহির্বিভাগে বা তেমন অসুবিধে হলে জরুরি বিভাগে আসবেন। আপাতত আর তেমন কিছু দরকার নেই।' এই সব করে চেয়ারে বসেছি অমনি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে কোনো এক কেউকেটা প্রায় গোটা কুড়ি সাগরেদ নিয়ে এমার্জেন্সিতে হাজির। তিনি নাকি লোকাল কাউন্সিলার ও মহিলা তাঁর আত্মীয়া। তিনি এসে প্রায় অর্ডার দিয়ে বললেন রোগীণীকে ভর্তি করে দিতেই হবে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে রোগীণীকে ভর্তি করার কোনো দরকার নেই।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে জরুরি বিভাগের দায়িত্বে থাকা সিনিয়ার রেসিডেন্ট ডাক্তার (SROD) বেরিয়ে এসে সাদা পোশাকের লোকটিকে বললেন, 'স্যার, আপনি একটু রোগীর কাছে অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি কী হয়েছে, সব ব্যবস্থা করছি।' তারপর SROD আমাকে ডেকে বললেন, রোগীণী হচ্ছেন শাসক দলের কাউন্সিলারের আত্মীয়া, ফোন এসেছিল তাঁর কাছে। ভর্তি করে দিতে হবে। আমাকে বললেন: 'চ্যানেল করে স্যালাইন চালাও আর আই.ভি অ্যান্টিবায়োটিক [অর্থাৎ শিরায় দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিক] দাও।' আমি বললাম: 'স্যার রোগীণীর শরীরে জল কমে যাওয়ার কোনো লক্ষণই তো নেই। তাও স্যালাইন . . . তাছাড়া মাত্র একবেলার পায়খানা ও বমিতে অ্যান্টিবায়োটিক কেন দেব? . . .'

SROD বিরক্তির সুরে বললেন, 'এই ছেলেটা বড্ড গেঁড়ে। . . .' তারপর আর একজন ইন্টার্নকে নিয়ে নিজেই রোগীণীকে স্যালাইন ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া শুরু করে দিলেন, আর তার ১৫ মিনিটের মধ্যে জরুরি বিভাগের কাছে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে (Observation word) রোগীণী ভর্তি হয়ে গেলেন। সেই রাতে তারপর আমি নিজে বেড না থাকার জন্য প্রায় ১৪জন মতো রোগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার করেছি, যাদের মধ্যে অন্তত তিন জনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক ছিল। সকালে যখন ডিউটি থেকে বেরোব তখন দেখি রোগীণী বেডে বসে এক হাতে চায়ের কাপ, চুমুক দিচ্ছেন, অন্য হাতে স্যালাইন চলছে। আর আমি প্রায় ১৮ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে ঘুম ও ক্লান্তি মাখা চোখে হোস্টেলে ফিরলাম গায়ে 'গেঁড়ে' তকমা সেঁটে।

[প্রসঙ্গত: বমি-পায়খানা হওয়া রোগীর শরীরে জলশূন্যতার কোনো লক্ষণ না থাকলে এবং যে রোগী মুখে পরিমাণ মতো খেতে পারছেন, তার ক্ষেত্রে স্যালাইন দেওয়া ভিত্তিহীন।]

ঘটনা ৩

গত শীতের শুরুর কথা, বাবা-মা-ভাই গেছে মানালি ঘুরতে, আমি যথারীতি কলকাতায়। বাড়িতে এসে রয়েছেন দাদু ও দিদা। এমন সময় একদিন রাত সাড়ে তিনটেয় হঠাৎ ঘুম ভাঙল জেঠুর ফোনে। এখন রাত্রে ঘুমের মাঝে এর-ওর শারীরিক সমস্যা নিয়ে ফোন এলে একটু বিরক্তই লাগে। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি রাত্রি ১টা থেকে জেঠু আর দিদার ফোন থেকে প্রায় দশের ওপর মিস্‌ড কল। নিশ্চয়ই কিছু জরুরি দরকার। তাই ফোন করলাম জেঠুকে। জেঠু ফোন ধরে বললেন, 'তুই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দীঘা হাসপাতালে চলে আয়। দাদু মারা গেছেন। আর কাউকে জানাতে পারিনি।'

বমি-পায়খানা হওয়া রোগীর শরীরে জলশূন্যতার কোনো লক্ষণ না থাকলে এবং যে রোগী মুখে পরিমাণ মতো খেতে পারছেন, তার ক্ষেত্রে স্যালাইন দেওয়া ভিত্তিহীন

আমি ওই অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। দিন চার আগে বাড়িতে দেখা হয়েছিল দাদুর সঙ্গে, দিব্যি সুস্থ মানুষ। হার্টের রোগ আছে বটে। কিন্তু নিয়মিত ওষুধ খান। জীবনযাপনে তেমন অনিয়ম করেন না। তিনবছর আগে একবার হার্ট অ্যাটাক নিয়ে কলকাতার এক নামি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রায় দু-লক্ষ টাকা খরচে হার্টে স্টেন্ট বসিয়ে তো বেশ দিব্যি চলছিল। কী যে হল হঠাৎ করে? দুঃখ হচ্ছিল খুবই কিন্তু কী করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে পরিবার-পরিজনদের খবর দিলাম। পৌঁছাতে জেঠু বললেন: 'রাত সাড়ে বারোটা থেকে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা শুরু হয় ওঁর, সঙ্গে ঘাম ও বমি। প্রথমে জিভের তলায় বড়ি (সরবিট্রেট) দিলে কিছুক্ষণ পরে ব্যথা কমে। তারপর আধঘণ্টা পর থেকে আবার ব্যথা বাড়তে থাকে, সঙ্গে অল্প অল্প শ্বাসকষ্টও শুরু হয়। বোন প্রেশার, পালস্ মেপে দেখে ঠিক আছে। হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ভেবে তাড়াহুড়ো করে রাত্রি দেড়টা নাগাদ দীঘা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। হাসপাতালে যেতেই ডাক্তার অক্সিজেন ও স্যালাইন চালু করে দিল। কিছুক্ষণ পর শ্বাসকষ্ট আরও বাড়তে থাকল। ১ ঘণ্টা পর ইসিজি করে যখন আবার ডাক্তার দেখল তখন খুবই শ্বাসকষ্ট। ডাক্তাররা তখন অনেক চেষ্টা করল কিন্তু এক বোতল স্যালাইনের পর দ্বিতীয় বোতলটা আর পুরোটা টানতে পারলেন না, তারপর ডাক্তাররা জানাল উনি আর নেই . . .'। এসব শুনে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হচ্ছিল।

[প্রসঙ্গত: আসলে দাদুর আবার একটি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, এবং তারপর হার্ট ফেলিয়োরও শুরু হয়েছিল। এমত অবস্থায় রক্তচাপ ঠিক থাকার পরও স্যালাইন দেওয়ায় হিতে-বিপরীত হয়। রক্তের আয়তন আরও বৃদ্ধি পায় এবং হার্টের ওপর আরও চাপ বাড়ে। হার্ট ফেলিয়োর আরও বেড়ে গিয়ে অবস্থার অবনতি হয়েছিল এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।]

ঘটনা ৪

হাউসস্টাফশিপের শেষ দিককার কথা, মেডিক্যাল কলেজের হার্টের বিভাগের (Cardiology) আউটডোরে রোগী দেখা শেষ করে উঠেছি। এমন সময় সার্জারি বিভাগ থেকে রেফার এসে হাজির। আমি আর স্যার চললাম রেফার দেখতে। দেখি এক বৃদ্ধ ফোলা হাত-পা নিয়ে বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। রেফার কাগজে লেখা রয়েছে বৃদ্ধের পূর্বের ইসিজিতে নাকি হার্টে রক্ত চলাচলের সমস্যা ছিল। অপারেশনে খাদ্য নালীর একাংশ টিউমারের কারণে কেটে বাদ দেওয়ার তিনদিনের মাথায় রোগীর এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই কী করা যায় তার উপদেশ জানতে চাওয়া হয়েছে। তারপর রোগীর ইতিহাস ও কাগজপত্র দেখে আমাদের তো চোখ ছানাবড়া। অপারেশনের পরদিন রোগীর রক্তে সোডিয়াম (Na+)-এর পরিমাণ কিছুটা কমে যায়। তাই চিকিৎসার কারণে রোগীকে বেশি সোডিয়ামযুক্ত ঘন দ্রবণ শিরা দিয়ে স্যালাইন আকারে দেওয়া হয়েছে যদিও ওই স্বল্প মাত্রায় সোডিয়াম কম থাকার চিকিৎসা হিসাবে বেশি সোডিয়ামযুক্ত ঘন দ্রবণ দেওয়ার যৌক্তিকতা ছিল বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তারপর আর তা বন্ধ করা হয়নি এবং প্রায় আড়াই দিন যাবৎ প্রায় ৮ বোতল ঘন সোডিয়ামযুক্ত দ্রবণের স্যালাইন পেয়েছেন রোগী এবং তা কারোর নজর কাড়েনি। আর এদিকে রোগীর হাত-পা ফুলে ঢোল এবং প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট অর্থাৎ হার্ট ফেলিয়োর হচ্ছে। যদিও শেষ অবধি সে যাত্রায় রোগী বেঁচে যান ডাক্তারদের তৎপরতায় ও পরবর্তী চিকিৎসায়।

[প্রসঙ্গত: আসলে বেশি সোডিয়াম যুক্ত দ্রবণ মাত্রাতিরিক্ত দেওয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায় এবং সেই সোডিয়াম আরও বেশি জল শোষণ করে, ফলে শরীরের সেই জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই হাত পা ফুলতে থাকে ও সঙ্গে হার্ট ফেলিয়োর হতে থাকে। তাছাড়া রক্তে সোডিয়ামের সীমা স্বাভাবিক ছাড়িয়ে আরও বেড়ে যাওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটে]

প্রচলিত ধারণা

এই ধরনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে আপনারও হয়তো কম-বেশি পরিচিত, কাজের সুবাদে হয়তো আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় একটু বেশি। আমার এক স্যার মজা করে বলতেন ''বাবা তোমরা তো সুযোগ পেলেই চ্যালেঞ্জ (চ্যানেলকে ইচ্ছাকৃত বিকৃত করে) দিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে দাও।' কথাটা খুব ভুল নয় সাধারণ মানুষের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে—

১. স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে মানে রোগীর অবস্থা বেশ জটিল।

২. আপৎকালীন অবস্থায় স্যালাইন অত্যন্ত জরুরি।

৩. বারংবার বমি ও পায়খানা হলে স্যালাইন দেওয়া খুবই দরকার।

স্যালাইনও ওষুধ!

স্যালাইনগুলিও আসলে হল এক ধরনের ওষুধ। এগুলি মূলত ব্যবহার করা হয় দেহের জলের ও লবণ বা আয়ন (Na^+, K^+, Cl^- ইত্যাদি)-এর ঘাটতি মেটাতে, যখন ওই ঘাটতি মুখের খাবার ও পানীয় দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া স্যালাইন দিয়ে পুষ্টির জোগানও দেওয়া হয় ক্ষেত্রবিশেষে। কিন্তু অন্যান্য ওষুধের মতো স্যালাইনেরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে ও তা অনেক সময় প্রাণহানি পর্যন্ত করতে পারে। তাই স্যালাইনের সঠিক ব্যবহার ও তার মাত্রা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি স্যালাইনের ব্যবহার উভয়ই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই অন্যান্য ওষুধের মতো স্যালাইনেরও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি মনে রাখা দরকার—অযথা শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন দেওয়ার পরিণামে অনেক সময় রক্তে সংক্রমণও ঘটে চ্যানেল থেকে। চ্যানেল মানে হল যে নলটা দিয়ে স্যালাইন শিরার মধ্যে ঢোকানো হয়—সেটা সুঁচও হতে পারে। তবে অনেকক্ষণ বা অনেকদিন ধরে স্যালাইন দেবার দরকার হলে পলিথিন জাতীয় দ্রব্যের নল দিয়ে 'স্যালাইন' (অর্থাৎ যেকোনো শিরার মধ্যে দেবার ওষুধ বা দ্রবণ) চালানো হয়।

বাস্তব পরিস্থিতি

রোগের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভয় ও অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ডাক্তার (পাশ ও অ-পাশ উভয়ই), বহু নার্সিংহোম, প্রাইভেট হাসপাতালগুলি এক ব্যাবসার আসর বসিয়েছে। বমি ও পায়খানা নিয়ে কোনো রোগী এলেই তাকে স্যালাইন চালিয়ে দেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে। যতদূর আমি দেখেছি, স্যালাইনের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় জরুরি বিভাগে, সার্জারি ওয়ার্ডে ও আপৎকালীন মেডিসিন (Acute Medicine) ওয়ার্ডে। অপারেশনের সময়, স্থিতিশীল মেডিসিন (Chronic Medicine) ওয়ার্ডে, আইসিইউ সিসিইউ-এর মতো বিভাগগুলিতে স্যালাইনের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার তুলনামূলক কম।

স্যালাইন চললে রোগীর শরীরে জল ও আয়নের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি তালিকা (Fluid Intake Output Chart) অনুযায়ী দৈনিক হিসেব

রাখার কথা। দেখা গেছে বেশির ভাগ ওয়ার্ডে তা ব্যবহৃত হয় না বা ব্যবহৃত হলেও তা লোক দেখানো। আবার বমি পায়খানার জন্য শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে অনেকে নরম্যাল স্যালাইন (০.৯% NS) দেন, যদিও কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এমন অবস্থায় রিংগার ল্যাকটেট দ্রবণ (RL) অর্থাৎ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড ও ল্যাকটেট যুক্ত দ্রবণ দেওয়া বৈজ্ঞানিক। এ নিয়ে নানা তর্ক ও ভিন্নমত রয়েছে—এটাও বলে রাখি। নির্বিচারে নরম্যাল স্যালাইন দেওয়া উচিত নয়, এটাতে সন্দেহ নেই।

হার্ট ফেলিয়োরও শুরু হয়েছিল। এমত অবস্থায় রক্তচাপ ঠিক থাকার পরও স্যালাইন দেওয়ায় হিতে-বিপরীত হয়।

অনেক সময় সরকারের নানা নীতিও বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পরোক্ষ মদতদাতা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আয়লার সময় সরকারের তরফে আয়লা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ব্যাপক হারে স্যালাইনের বণ্টন করা হয়। বহু ক্ষেত্রে সরকারি ডাক্তার বা অনেক সময় অপাশ-করা ডাক্তার অনেক রোগীকে কোনো দরকার ছাড়াই অল্প বমি-পায়খানাতেই স্যালাইন দিয়েছেন—আয়লা বিধ্বস্ত অঞ্চলে মেডিক্যাল ক্যাম্প করে এমনটাই অভিজ্ঞতা আমাদের। অথচ খুব কমই এমন রোগী ছিল যাদের স্যালাইন দেওয়া দরকার ছিল।

তাহলে কখন স্যালাইন দেওয়া দরকার?

স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা বহু ক্ষেত্রেই দরকার—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই লেখায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবুও সাধারণত যে যে কারণগুলিতে স্যালাইন দেওয়া দরকার পড়ে তা হল—

১. শরীরে জলের পরিমাণ অনেকটা কমে গেলে (Severe dehydration): এর লক্ষণগুলি হল—ঠোঁট ও জিভ শুকিয়ে যাওয়া, প্রস্রাব অনেক কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে যাওয়া, হঠাৎ ওজন ১০ শতাংশ বা তার বেশি কমে যাওয়া, উপরের রক্তচাপ ৮০-এর নীচে নেমে যাওয়া, নাড়ির (Pulse) গতি বেড়ে যাওয়া ও তার সঙ্গে নাড়ি দুর্বল হয়ে যাওয়া, ছোটো বাচ্চাদের মাথার মাঝখানের নরম অংশ বসে যাওয়া।

২. রক্তক্ষরণ বা অন্য কোনো কারণে রোগী শকে চলে গেলে (hypovolemic shock) : এর লক্ষণগুলি হল—উপরের রক্তচাপ মাপা যাচ্ছে না বা ৮০-এর নীচে নেমে যাওয়া, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না বা খুব দুর্বল ভাবে দ্রুত নাড়ি যাচ্ছে।

৩. শরীরে লবণ অর্থাৎ আয়নের অভাব ঘটলে।

৪. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা কমে গেলে।

৫. রোগীর পুষ্টি মুখে খেয়ে বা নাক দিয়ে পাকস্থলি পর্যন্ত নল দিয়ে (খাদ্য নল) মেটানো যাচ্ছে না।

৬. রোগীর অবস্থা এমন যে মুখে বা খাদ্যনল দিয়ে খাবার ও জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৭. কিছু কিছু ওষুধ [যেমন ক্যান্সারের ওষুধ, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, কিছু খিঁচুনির ওষুধ ইত্যাদি] স্যালাইনের সঙ্গে বা স্যালাইন হিসেবে দিতে হয়।

৮. অপারেশনের সময় বা তার পরবর্তীতে।

এটা পুরো তালিকা নয়, কিন্তু এগুলোই প্রধান কারণ। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

সমাধান

১হি	❖	❖	❖	২আ	ল	৩ট্রা	সো	নো	গ্রা	৪ফি	❖
মো	❖	❖	৫বা	য়ো	❖	ই	❖	❖	❖	৬ট	ফি
৭গ্লো	৮কো	৯মা	❖	ডি	❖	১০গ্লি	সা	রি	ন	❖	❖
১১বি	লি	রু	বি	ন	❖	সা	❖	❖	❖	❖	❖
ন	❖	ন	❖	❖	❖	রো	❖	❖	১২শ্বা	❖	১৩এ
❖	❖	❖	১৪প্যা	❖	❖	১৫ই	ডি	১৬পা	স	❖	ন
❖	❖	১৭প্যা	রা	ন	য়ে	ড	❖	ল	❖	❖	কে
১৮চি	❖	রা	❖	❖	❖	❖	❖	স	❖	❖	ফে
১৯রু	বে	লা	❖	❖	❖	❖	২০কো	❖	❖	২১লা	লা
নি	❖	২২ই	ন	স	ম	নি	য়া	❖	❖	❖	ই
❖	❖	জ	❖	❖	❖	❖	ক	❖	২৩হা	❖	টি
২৪সা	ই	ড	এ	ফে	ক্ট	❖	❖	২৫টা	ই	ফা	স

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পঞ্চম পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপি-র অনেক আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বিয়ের পর জীবন যে রকম

এখন আমি ঘরের বউ। আমাকে বলা হল বাইরে বেরোবে না, ছুটোছুটি করবে না আর বারমহলের দিকে যাবে তো নাই, চোখ তুলেই তাকাবে না। আমার কাজ হল ঘরের এককোণে গুটিসুটি মেরে পরে থাকা। এইসব বিধিনিষেধের কথা শুনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমি ছটফট করতে থাকলাম। কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমার কচি বয়সকালটাকে চিরকালের জন্য মাটির গভীরে পুঁতে ফেলা হয়েছে। জ্বলেপুড়ে মরছিলাম আর মনে মনে, ভাবছিলাম, ওরা আমাকে এভাবে মেরে ফেলতে চাইছে কেন? কয়েক দিন বাদে শুনলাম, আমাকে আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজোর সময়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে আমি চোখের জলে নাকের জলে একাকার। কিন্তু কারও তাতে মন গলল না। মাঝে মাঝে খুড়িমা এসে ধমকাচ্ছেন, হাপুস নয়নে অত কান্নার কী আছে! আদিখ্যেতা! দেখছ না আমাদের সবাইকেই শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়, ওরা অনুমতি দিলে তবেই বাপের বাড়ি ফিরতে পারি। আমি বললাম, তোমাকে তো ঠাকমা-দিদিমারা দিবারাত্রি দাঁতে কোটে, শ্বশুরবাড়িতে কি আমাকেও নিত্য গঞ্জনা সইতে হবে? তিনি বললেন, তা তো একটু-আধটু হবেই; শ্বশুরবাড়িতে সকলকেই গঞ্জনা, ধমকধামকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। শ্বশুরবাড়িটা কেমন, তার ধারণা আমার এসেছিল খুড়িমার কাছ থেকে। তিনি আমাকে পাখিপড়ার মতো শিখিয়েছিলেন— শ্বশুর-বাড়িতে কী করব আর কী করব না। তাঁর শাশুড়ি তাঁকে অনেক সময়ে বিনা কারণেই বকাঝকা করতেন। সেসব কথার কী ছিরি! এখনও মনে পড়লে আমার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। একবার খুড়িমা কোথাও একটা বসে একটু জিরোচ্ছিলেন। বড়ো ঠাকমা এসে দিলেন ধমক, ‘এই অবেলায় তোলোমুখ করে বসে আছ কেন শুনি, কাজকম্ম সব কি শিকেয় উঠেছে? বাপের-বাড়িতে মরেছে নাকি কেউ? বাপভায়েরা সবাই মরেছে বুঝি—শোক যেন উথলে উঠছে! বাছা আমার! তোমাকে তো আবার কেউ কিচ্ছুটি বলতে পারবে না—তা হলেই চিত্তির! চোখের জলের বান ডেকে যাবে! মরি, মরি, কী অপরূপ মুখের ছিরি! জোড়া ভুরু, মুখ পুড়ে যেন কালশিটে মেরে গেছে। তার ওপরে বেড়ালের মতো কটা চোখ! চলাফেরার বহর দেখ, যেন ধুঁকছে, যেন বুনো একটা পাখি ঝোপেঝাড়ে ছটফট করে মরছে!’ এসব গা-জ্বালানো কথা হরবখত শুনতাম, বেচারি খুড়িমার জন্য খুব মায়া হত, মন কেমন করত। সব থেকে খারাপ ব্যাপার হল, এসব হুল-বেঁধানো গঞ্জনা দেওয়ার জন্য কোনো কারণ-টারণের বালাই ছিল না। খুড়িমা আর কী করবেন—চুপ করে শুনতেন। তার মহা অপরাধটা কী? একটা *অন্নদামঙ্গল* (ষোড়শ শতকের মঙ্গলকাব্য) বই মেঝেতে পড়ে ছিল।

নতুন বউয়ের এমন হেনস্থা দেখে, তার উপর যে অকথ্য নির্যাতন চলত—সেসব আমি একদম সইতে পারতাম না। রাগে ফুঁসতাম। এখন আমাকে সেই একই জাঁতাকলে ফেলে দেওয়া হল—কী করব, না করব, ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। আমাকেও শ্বশুরবাড়িতে একইভাবে পদে পদে হেনস্থা হতে হবে! থাক সে কথা। এসব নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে হবেটাই-বা কী! কিন্তু সে সময়ে বাড়ির মেয়ে-বউরা কী নিদারুণ দুর্দশায় কাটাত, তা নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার।

বাড়িতে যে ভালো ভালো খাবার রান্না

হত, তার ভাগ বউয়েরা পেত না। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে শেষ পাতে যদি কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকত, তবেই তাদের কপালে হয়তো জুটত ভালো খাবারের ছিটেফোঁটা। অন্যথা নয়। অনেক পরিবারেই বউদের ভরপেট ভাতও জুটত না। খিদের জ্বালায় ওরা ছটফট করত। সেজন্য ওরা কিছুটা ভাতের ফ্যান সরিয়ে রাখত। যদি তা কখনো কোনো বউ-কাঁটকি শাশুড়ির নজরে পড়ে গেল তো ব্যস হয়ে গেল! তিনি তক্ষুনি ফ্যানের গামলা ধরে গোরু-ছাগলকে খাইয়ে দেবেন; স্রেফ মেয়ে-বউগুলোকে জব্দ করার জন্য। ছেলের-বউ যে এই কথা স্বামীর কানে তুলবে, তার কোনো উপায় ছিল না। কালেভদ্রে হয়তো কোনো বউ স্বামীকে নালিশ জানাত; সে যদি এসব নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলত—তবে তো বাড়িশুদ্ধ সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ বউয়ের বাপের-বাড়িতে খবর পাঠিয়ে, তল্পিতল্পাসহ বউকে বাপের-বাড়ি পাঠিয়ে, ছেলের ফের বিয়ে দিয়ে তবে অন্নগ্রহণ করতেন। সেকালে স্বামীগুলোও নচ্ছার কিছু কম ছিল না। আমার তো মাথাতেই ঢোকে না, ওরা কী করে অসহায় নির্দোষ বউগুলোর সঙ্গে

সেকালে স্বামীগুলোও নচ্ছার কিছু কম ছিল না

দিনের পর দিন এমন জঘন্য অন্যায় চালিয়ে যেতে পারত। বাবা-মায়েরা আকছার দোজবর, তেজবরে বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পার করতেন; এমনকী বহুবিবাহ করেছে, এমন লোকের হাতেও তারা মেয়ে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। যেমনটা আমি বললাম, সেকালে এদেশে স্বামী-শাশুড়িরা প্রায় সকলেই অমন ধারা ছিল।

ইটটি মারলে পাটকেলটি তো খেতেই হবে। আমি দেখেছি বউয়েরা কীরকমভাবে শাশুড়িদের নাজেহাল করে মারছে। এমন আচার-আচরণকে মোটেই ভালো বলা যাবে না—সে শাশুড়ির হোক কি বউয়ের। বালিকা বধূ স্বামীর ঘর করতে এল—শাশুড়ির থেকে মায়ের মতো স্নেহ যত্ন ভালোবাসা পাবে—এই আশা নিয়েই তো সে এসেছে। অথচ শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে না দিতেই তার সঙ্গে যে জঘন্য আচার-ব্যাভার শুরু হল, তার আর ক্ষান্তি নেই—যতক্ষণ না কচি মেয়েটার মন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায়। গাঁ-গ্রামের দিকে স্বামীরাও হামেশাই স্ত্রীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে মা-বাবার ভয়ে। লায়েক হয়ে উঠলে এই গুণধর ছেলেরাই আবার মা-কে থেঁতলাতে কসুর করে না। আগে যেমন শাশুড়িরা ছেলের-বউদের ওপর নির্যাতন চালাত, এখন ছেলের-বউরা তার শোধ তুলছে—শাশুড়িদের শিলনোড়ায় বাটছে! তাদের ঝিয়ের মতো খাটিয়ে নিচ্ছে। মায়ের দিকে ছেলে মেয়েদের তাকানোরও ফুরসত নেই! তিনি বাড়ির এককোণে ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোমতে দিন গুজরান করছেন। যেসব কাজ ঝিয়েরা করে, বাড়ির সেই সব কাজ মা-কে দিয়ে করিয়ে নিতে অনেক ছেলেই বেশ আমোদ পায়। এমনকী সুপুত্তুর তামাক খাবেন—তার হুঁকো-কলকেটাও মা-কে সাজিয়ে দিতে হয়। বুড়ি মা-কে রোজ বাসন মাজা, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, রান্নাবান্না করতে হয়। ছেলের-বউয়ের ঘুম থেকে উঠতে রোজই দেরি হয়; তার আবার মাথাধরার ব্যারাম আছে কিনা! এ দুটোর কোনোটাকেই আমার ঠিক মনে হয় না। এখন এ কথা থাক। এসব ভাববার ফুরসত কই আমার! আমার এখন আসল মাথাব্যথা—এরকমই একটা শ্বশুরবাড়িতে আমাকে যেতে হবে; বাকি জীবনটা এভাবেই কাটাতে হবে—ভেবে ভেবে আমার মাথাখারাপ হওয়ার জোগাড়। দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ ঘনিয়ে এল, আমার তলব পড়ল শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার। শুক্লপক্ষের চতুর্থ দিন রাতে যদি খুলনায় শ্বশুরবাড়ির দিকে রওয়ানা হই, তবে পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌঁছোনোর কথা। সেইমতো যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন হল। যাওয়ার পথে সারাক্ষণ আমি কেঁদে ভাসালাম। ভয়ে আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল। আমার অজান্তেই কী যে একটা কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে ফেলব, সে ভয়ও কিছু কম ছিল না। এবার আমার সঙ্গী, আগের সেই ঝি-টি নেই, তার বদলে বিশেকাকা (বাড়ির চাকর)। কী করব না করব, কার কাছে আমি জানতে চাইব? বিশেকাকাকে বলে তো কোনো লাভ নেই। ভয়ে দুরুদুরু বুকে আমি ধীর পায়ে হাঁটছিলাম; আমি চাইনি তবু পায়ের নূপুর বেজে উঠছিল রুনুঝুনু রবে। আশেপাশে কয়েকটি কচি মেয়ে ঘুরঘুর করছিল। ওরা অবশ্য কেউ আমার সৎ মেয়ে নয়। একজন আমার স্বামীর খুড়তুতো বোন, আর জনা তিন-চারেক আমার ভাশুরের মেয়ে। একজনের নাম বিধু, একজনের নাম কাঁটালি আর একজনের নাম মতু। আর দু-জন, কুসুম ও চমৎকার, আমার স্বামীর ভাগ্নি। এরা ছাড়াও ছিল একটি নতুন কনে, আশুতোষ মিত্রর বউ। এতগুলো সঙ্গীসাথী পেয়ে বুকে একটু বলভরসা এল। মতুকে বললাম, 'সই! এখানে কীভাবে চলতে হয়, কিছুই তো জানি না; কোথায় পায়খানা, কোথায়-বা চানঘর, কীভাবেই-বা যাব? আমার থেকে বয়সে একটু বড়ো এই মেয়েটি আমার অসুবিধাগুলো মুহূর্তে বুঝে নিয়ে কীভাবে কী করতে হবে, আমাকে দেখিয়ে দিতে লাগল। কুসুমও যথেষ্ট সাহায্য করছিল। কিন্তু যখন আমি ওর কোনো-একটা কথা বুঝতে পারছিলাম না; সেটা সকলকে বলে বেড়িয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। ফলে মতুর উপরই আমি ভরসা করছিলাম বেশি। ননদের সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু বেশিদূর এগোনো গেল না। সব্বাইকে ও আমার নামে মিথ্যে মিথ্যে বলে বেড়াতে লাগল, 'ও আমাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে, নতুন-বউ আমাকে ধরে মেরেছে।' এইরকম

ভয়ে দুরুদুরু বুকে আমি ধীর পায়ে হাঁটছিলাম; আমি চাইনি তবু পায়ের নূপুর বেজে উঠছিল রুনুঝুনু রবে।

হাজারো-একটা নালিশ। আমি তো ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেলাম; ওর সঙ্গে মিতালি পাতানোর সখ আমার কর্পূরের মতো উবে গেল। আমি যে ওকে এড়িয়ে চলছি, বুঝতে পেরে ও গেল আরও রেগে। আমার নামে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে নালিশ ওর মায়ের কাছে লাগাতে লাগল। আমার রক্ষাকর্ত্রী মতু সব্বাইকে বলে দিল, 'নতুন-বউ কিচ্ছুটি করেনি, ওই মেয়েটাই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছে।'

বড়ো ননদ আমাকে নিয়ে এলেন বরের ঘরে। আমি নিঃশব্দে মড়ার মতো শুয়ে রইলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু; ঘুমের ঘোরেই টের পেলাম, কেউ আমার গা থেকে কাপড় সরিয়ে নিচ্ছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম, কাপড়টা টেনেটুনে কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

পুজো কেটে গেল। শাশুড়ি কিন্তু একবারের জন্যও আমার সঙ্গে গলা চড়িয়ে কথা বলেননি; এমনকী তাঁকে কোনো ছেলের-বউকেই বকাঝকা

করতে আমি শুনিনি। এখন আর আমার অত ভয়ডর নেই। পুজোর পর সকলেই পরিবার নিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। থেকে গেলাম শুধু আমি, শাশুড়ি আর আমার দুই সৎমেয়ে। পরিবারের অন্যান্য শরিকরা, যাদের বসবাস এখানেই, তারাও রইল। আমাকে যেতে হবে স্বামীর কর্মস্থলে। শাশুড়িই নিয়ে যাবেন সঙ্গে—একরত্তি এই মেয়েটাকে একা একা তো আর পাঠানো যায় না, লোকেই বা বলবে কী! তখন পর্যন্ত শাশুড়ি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছেন। ঠেস দিয়ে কটু কথা বলা বা উঠতে-বসতে হেনস্থা করা—এসব কিছুই করেননি। আমরা তিনজন ওঁর কাছেই শুতাম। মতুর মা বাড়ির দেখভাল করত; একা হাতে বাড়ির যাবতীয় কাজ সামলাত। সে সময়ে ওর একটা কোলের ছেলে। ছেলেটাকে আমিই সারাদিন কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, দুধ খাওয়াতাম। মতুর মা তাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন। টুকিটাকি যেসব কাজ তিনি আমাকে দিতেন; মন দিয়ে সেরে ফেলতাম। কোনোদিন তাঁর কথার অবাধ্য হইনি। দেখতে দেখতে ওঁর ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন এসে গেল। তিনি আমাকেই ভাত রাঁধতে বললেন। আমি মহা উৎসাহে কোমরে শাড়ির আঁচল বেঁধে ভাত আর পায়েস রাঁধতে লেগে গেলাম। এভাবে আমাকে কাজে নামতে দেখে সকলে দু-হাত তুলে আমাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। বলল, দেখে নিও কালে কালে এই নতুন বউ পাকা গিন্নি হয়ে উঠবে। তখন কি কেউ ভেবেছিল, ভগবান আমার কপালে কী লিখে দিয়েছেন—জীবনভর আমাকে যে অক্লান্ত হয়রানিতেই কাটাতে হবে! সেই থেকে শিশুদের ভাত রান্নার ভার পড়ল আমার উপর; আমিও মহা ফুর্তিতে ভাত রাঁধতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে দু-মাস হয়ে গেল। বাবা শীতের মরশুমের উপহার-সামগ্রী পাঠালেন। পুজোর উপহার সব আমার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়েছিলেন। এবারে উপহারের সঙ্গে তিনি অনুরোধ করলেন—আমাকে একবার বাপের-বাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কী যে আনন্দ হল, সব ভুলে আত্মহারা হয়ে আমি নেচে উঠলাম! শাশুড়ি জানালেন, এখন যাওয়া হবে না, কেননা আমাকে নিয়ে যাওয়ার মতো চলনদার সঙ্গী কেউ নেই। আমাদের যশোরে যাওয়ার কথা, সেখানে পৌঁছে তারপর দেখা যাবে। এসব কথা আমার তেমন কানেই ঢুকল না, মনে একটা ভাবনাই গুনগুন করছে—এবার আমার বাড়ি যাওয়া হবে। কয়েক দিন বাদে দুটো পালকি এল—একটাতে উঠলাম আমি আর পাঁচি, আর-একটাতে শাশুড়ি আর বুচি। দুলকি চালে রওয়ানা দিল পালকি। সে সময়ে পালকি-বেহারারা প্রায় সবাই মুসলমান। ওরা বিচিত্র শব্দে-সুরে হাঁকডাক করতে করতে পালকি বয়ে নিয়ে চলল। দুটো পালকির ষোলোজন বেহারা। সকলে মিলে যখন চেঁচাচ্ছিল তখন ওই বিকট শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়! মনে হচ্ছিল ওরা যেন দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছে। রাস্তার দু-পাশে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল পালকি-যাওয়া দেখতে। বিশেখুড়ো আগের দিন রাতেই গোরুর গাড়িতে করে মালপত্তর নিয়ে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে আমরা রাস্তায় মিললাম।

ভোর ভোর আমরা রওয়ানা দিয়ে দিলাম। তার আগে সামান্য ফেনাভাত খাওয়া হয়েছিল। তবু শাশুড়ি চলার পথে আমাদের কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য বারবার বলছিলেন। আমি তখন আমার শাশুড়ি আর ঠাকমার বউমাদের প্রতি আচার-ব্যাভারের ফারাকটা ধরবার চেষ্টা করছিলাম। আমার শাশুড়ি কত দরদি আর ঠাকমা কী নিষ্ঠুর! আমি তো কখনো দেখিনি, ঠাকমা খুড়িমাদের ভালোমুখে কোনোকিছু বলেছেন বা আদর করেছেন। সোহাগ দেখানো তো দূরের কথা; তাঁর আচার-আচরণে দরদের ছিঁটেফোটাও দেখিনি। শ্বশুরবাড়িতে এতদিন যাঁর স্নেহ-মমতা পেয়ে এসেছি, তিনি মতুর মা। সে কারণে আমি টেরও পাইনি, শাশুড়ি আমাকে কতটা ভালোবাসেন। এবার সোজাসুজি বুঝতে পারলাম তাঁর ভালোবাসার মাত্রাটা। শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল। কিছু পরে আমরা আমাদের বাড়িতে পৌঁছালাম। খুলনায় আমাদের বাড়ি, চারটে ছোটো ছোটো বাড়ি নিয়ে; একটা পেয়ারা গাছ, সামনে একটা ছোট্ট পুকুর—নাম লালদিঘি। আশেপাশে সারি দিয়ে অনেকগুলো বাড়ি ----বয়স্ক উমেশবাবু, তরুণ উমেশবাবু—এরকম আরও অনেকের। শালকিয়ায় যখন খুশি যেমন খুশি বাড়ির বাইরে যাওয়া যেত; এখানে সে সুযোগটি নেই। মেয়েরা আশেপাশের পড়শিদের বাড়ি যেতে পারত কেননা ওদের সঙ্গে তো বহুদিনের আলাপ-পরিচয়। কিন্তু যেহেতু আমি কনে, আমাকে অন্তঃপুরের ঘেরাটোপেই থাকতে হত। অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। শাশুড়ি

আমার কপালে কী লিখে দিয়েছেন—জীবনভর আমাকে যে অক্লান্ত হয়রানিতেই কাটাতে হবে!

আমার মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিতেন, যাতে ওঁরা ভালো করে দেখতে পান; আমি চোখ বুজে থাকতাম। সেকালে এরকমটাই রীতি ছিল। আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছোলাম, তার মধ্যেই ভাত রান্না হয়ে গিয়েছিল। শশধর নামে একটা ছেলে ওই বাড়িতে রান্না করে। আমরা পৌঁছোতেই সে আমার শাশুড়িকে জেঠিমা বলে ডাকল। ও রান্নার সব জোগাড়যন্ত্র নিয়ে এল। শাশুড়ি ঘি দিয়ে কিছু তরিতরকারি রাঁধলেন, ডাল রাঁধলেন আরও দু-একটা পদ রাঁধলেন। রান্নার কিছুটা রাতে খাওয়ার জন্য আলাদা করে রাখলেন। এরকমই চলত নিত্যরোজ।

এখানে আমার ঘরের মধ্যেই আমার যা-কিছু চলাফেরা। কেননা বাড়িতে আর সবাই পুরুষ—চাকর শশধর ও আরও দু-জন—একজন আশুতোষ মিত্র, আরেকজনের নামটা আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না। শাশুড়ির ঘরেও আমি ঢুকতে পারতাম না—কেননা সে ঘরে সর্বদা হয় শশধর নয় আশুতোষ থাকত। শশধর হাতে হাতে শাশুড়ির সব কাজ করে দিত—জল আনত, বাটনা বাঁটত, চুলো জ্বালাত। আর এই সব কাজ করার সময় তার কোমরে জড়ানো থাকত একটা পাতলা ছোট্ট গামছা। আশুতোষ কিছুই করত না, কিন্তু ঠায় বসে থাকত শাশুড়ির ঘরে। আর একটা ঘরে দামি পালঙ্ক, একটা আলনা, আর দু-একটা বাক্স-প্যাঁটরা। এটা কর্তার ঘর। ওই ঘরই আমার আস্তানা হয়ে উঠল। আমার আর আমার সৎমেয়েদের তো কিছুই করার ছিল না। আমরা ওই ঘরে সারাটা বিকেল পুতুল খেলতাম। আমার বর বিকেলেই অফিস যেতেন, ঘরে কেউ থাকত না; আমরা মনের আশ মিটিয়ে খেলতাম। ঝ্যাঁটাকাঠি দিয়ে পুতুল বানিয়ে, তাকে জামাকাপড় পরিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিতাম। এক বিকেলে শাশুড়ির খাওয়া হয়ে গেলে ওঁরই থালায় ফেলে-রাখা খাবার আমি খাচ্ছিলাম; হঠাৎই কর্তা ঘরে ঢুকলেন, হাতে ঝ্যাঁটাকাঠির পুতুলগুলো। মজা করে

জিগ্যেস করলেন, 'মা! এগুলো কার ছেলেমেয়ে?' দুই মেয়ে জবাব দিল, 'ওই পুতুলগুলো আমাদের মায়ের, আমরা ওদের নিয়ে খেলি।' ভয়ে আমি তো প্রায় আধমরা; কিন্তু পরের দিন দেখি, ঝ্যাঁটাকাঠির বদলে সেখানে কতগুলো চিনেমাটির পুতুল। খুব ফূর্তি হয়েছিল। পুতুলগুলোকে তিনভাগ করে এক-একজন এক-একভাগ করে নিয়ে নিলাম।

ফের ব্যবস্থা নেওয়া হল, আমাকে কর্তার ঘরেই শুতে হবে। রাতের খাবার সারা হলে শাশুড়ি বললেন, 'যাও ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' কী আর করব আমি? ওঁরা আমাকে যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই থাকতে হবে। একা ঘরে শুয়ে থাকতে আমার খুব ভয় করত; কিন্তু একসময়ে ঘুমিয়েও পড়তাম। এক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন অনেক রাত। হিসি করার জন্য আমার একটু বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল। দেখি কী, কর্তা আর আরেকটা মেয়েমানুষ—দু-জনে একে অন্যকে শক্ত করে আঁকড়ে

'আরে! তুমি করছটা কী? তোমার বউ জেগে গেলে কী হবে তখন?'

ধরে সে কী উস্তমকুস্তম লাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েমানুষটা বলল, 'আরে! তুমি করছটা কী? তোমার বউ জেগে গেলে কী হবে তখন?' কর্তা বললেন, 'ধুর! ওর কথা ছাড়ো তো। ও ঘুমিয়ে পড়লেই কাদা, রাতে কক্ষনো ওঠে না।' আমি বিছানার একপাশে মরার মতো কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম। খানিক পরে দু-জনে গেলাসে মদ ঢেলে মদ খেতে লাগল। মদ খাওয়া শেষে মেয়েমানুষটা রাস্তার দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ ফর্সা হয়ে এল, আমি উঠে পা টিপে-টিপে হিসি করতে বেরোলাম। ওই ঘরে ফিরে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছিল না। বাইরে চানের জায়গাতেই বসে রইলাম। পরে শাশুড়ি ঘুম থেকে উঠলে, ওঁর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। শাশুড়ি জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ?' আমি বললাম, 'না, কাল রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'তোমার নিজের বরের ঘরে আবার ভয় কীসের?' বললাম, 'ঘরে কেউ এসেছিল আর মদ খাচ্ছিল, সেই জন্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' 'কারা মদ খাচ্ছিল?' বললাম, 'জানি না ওরা কারা।' তিনি আর কথা বাড়ালেন না, আমিও চুপ।

পরের দিন সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে যেমন রোজ বিছানায় গড়াই তেমনই শুয়ে ছিলাম। নিশুত-রাতে রাস্তার দিক থেকে একটা ডাক শোনা গেল, কোনো-এক মেয়ের গলা, ' ও আমার প্রাণের নাগর! দোরটা একবার খোলো না মাইরি। বাবু বললেন, 'কে, ব্রজ নাকি'?—'না গো, আমি ট্যাঁপা।' বাবু দোর খুলে দিলেন। মেয়েছেলেটা ঘরে ঢুকেই সরাসরি বাবুর উপর চড়াও 'কী ব্যাপার বল তো, এদানি দেখছি, ব্রজর সঙ্গে তোমার ঢলাঢলি আশনাইয়ের কোনো শেষ নেই কো!' বাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'আরে দেখ না, ও তো সোজা এ-ঘরে এসে ঢুকে পড়ল . . . কী বলি বল . . . এখন তো আমি আর বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে পারি না। মা মানা করে দিয়েছেন। আর দেখতেই তো পাচ্ছিস, আমার একটা নতুন কাজ জুটেছে। এখন আমায় ডিম ফুটিয়ে ছানা বের করতে হচ্ছে।' ট্যাঁপা বলে, 'তা তোমার ডিমটা কোথায়—দেখাবে না আমায়?' বাবু বলেন, 'ওই তো, বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে।' ট্যাঁপা একটা লম্ফের আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমার মুখটা ভালো করে ঠাহর করে নিল। 'আরি ব্বাস! কী সুন্দর কনে গো তোমার—রূপ যে একেবারে ফেটে পড়ছে! দু-বছর যেতে দাও; তুমি কি আর আমাদের মনে রাখবে? নামই ভুলে মেরে দেবে।' বাবু বললেন, 'তা বটে! কী কথাটাই না বললি তুই—যতদিনে এই ছুঁড়ি ডাগরটি হয়ে উঠোনে নাচতে নামবে; ততদিনে এই শর্মা তো কবরে শুয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকবে।' 'অত কপাল চাপড়িও না তো; বাড়ন্ত গড়ন, দু-দিনেই কেমন ফনফনিয়ে বেড়ে উঠবে দেখ। ওর কি মাসিক হয়েছে?' বাবু বললেন, 'না, না, সেসব কিছুই হয়-টয়নি। এখনও তো ওর কাঁড়-কাঁকুড় বোধই হয়নি।' 'আরে, পড়েছে তোমার হাতে, অত চিন্তার কী আছে! সবকিছু দেখতে-না-দেখতে শিখে-বুঝে নেবে। তোমা-হেন মানুষটাকে হেলাফেলা করে এমন বুকের পাটা কার! আমাকে যা জ্বালিয়েছ, সে কি ভুলে গেছি মনে কর। লজ্জার মাথা খেয়ে ওরকম যা-তা করা আমি কিন্তু আর মেনে নেব না বাপু।'—'কিন্তু ট্যাঁপা, বিশ্বাস কর, আমি সত্যি তোকে ভালোবাসি; না হলে তোর পেছনে অমন জলের মতো টাকা ঢালি।' 'হক কথা, মানছি; কিন্তু তা হলে ওটার সঙ্গে অত গা-ঢলাঢলি কীসের শুনি!' —'আরে, তুই যখন বাইরে নাচতে যাস, তখন আমি করবটা কী? আঙুল চুষব! তাই ওদের হাতে রাখতে দু-চার টাকা ছুঁড়ে দিই। কাল রাতে ও সোজা বাড়িতে এসে হাজির—কী করব বল। দিল-এ-জান! এবারের মতো ক্ষমাঘেন্না করে দে; বোতল-টোতল কিছু এনেছিস নাকি, এট্টু পেসাদ দিবি না!' এরপর ওরা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসে পড়ল। শুরু হল মদ খাওয়া। আর তারপরে?—যা অনাসৃষ্টি হচ্ছিল, তা মুখে আনা যায় না, নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমি মূর্ছা গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ওই মেয়েটা আমার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর বলছে, 'আমার শরীলটা নিয়ে যা করছিলে তুমি—যেন ছানা ডলছে! ঘরের মধ্যে অমন উদোম কোস্তাকুস্তি হলে, ওই একরত্তি মেয়ে ভিরমি খাবে না তো কি! এখনও কেমন কাঁপছে দেখ! সোনামণি, এরকমটি আর কক্ষনো করবে না তুমি। ও একটা ভালো ঘরের মেয়ে আর নেহাতই বাচ্চা। ওর কি এসব জানবার বয়স! তুমি যা শুরু করেছিলে তাতে ও ভয় পাবে না তো কি!' বাবু বললেন, 'মনে হয় তুই ঠিকই বলেছিস, সখী; আমরা কী করছিলাম, ধিঙ্গি মেয়েটা বোধ হয় দেখে ফেলেছে। কিন্তু আর কীভাবেই বা ও এসব শিখে নেবে?' 'তুমি একদম ভেবো না তো, কাঁটার ডগা আপনা থেকেই সুঁচোলো হয়ে ওঠে। কারও বাড়িতে বসে এসব করাটা একদম ঠিক না। এমন তো নয়, আমার নিজের কোনো ডেরা নেই যে আমাকে তোমার ঘরেই আসতে হবে। আমি আর কোনো দিনও আসব না। তোমাকেই আমার ডেরায় আসতে হবে। কথাটা ঢুকল কি মাথায়! বলো, কবে আসবে?' এই কথা বলে, উঠে দাঁড়িয়ে সে হনহন করে দোর খুলে বেরিয়ে গেল। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

মেনোপজে মনখারাপ

মধুছন্দা দত্ত

কিছুদিন হল সকালে ঘুম থেকে উঠতে গেলেই কীরকম ক্লান্তি চেপে ধরে মৌকে। একটা নতুন দিন শুরু করার যে আগ্রহ সেটাই যেন কোথায় হারিয়ে যায়। বিছানায় গড়াতে গড়াতে যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সবকিছুই খুব দেরি হয়ে যায়। প্রতিদিন রাতে আজকাল ঘুমোতে যাওয়ার আগে মৌ মনে মনে ভাবে পরের সকালে ঠিকঠাক সময়ে উঠবে। কোনো কিছুতেই দেরি করবে না। কিন্তু মৌ পারে না।

মৌ এই কিছুদিন আগেই ৪৭ বছর পেরোল। ঋতুস্রাব একেবারে দিনক্ষণ মেনে আর হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই দু-মাস পেরিয়ে হঠাৎ হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ডাক্তার জানিয়েছেন, মৌ এবার মেনোপজের দিকে এগোচ্ছে। ধীরে ধীরে এবার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার চিহ্নগুলো এবার ধীরে ধীরে প্রকট হবে। অনেকে এই সময় হরমোনথেরাপি করান। কিন্তু মৌ শুনেছে, তাতে অনেক সময় জটিলতা বাড়ে। তাই মৌ সেই চিকিৎসা করাতে চায়নি। আপাতত ক্যালশিয়াম নিয়মিত খাচ্ছে কিন্তু শরীর ভেঙে ক্লান্তি যেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। ডাক্তার বলেছেন, এরকমই এখন চলবে। এটাই স্বাভাবিক।

চাকুরে মৌয়ের কাছে পুরো বিষয়টি মানিয়ে নিয়ে চাকরি করে যাওয়া এখন একটা বড়ো লড়াই। ক্লান্তির সঙ্গে ইদানিং যোগ হয়েছে মনমেজাজ খারাপ থাকা। কারণে অকারণে মেজাজটা হঠাৎ খিঁচড়ে যায়। কখনো স্বামীর সঙ্গে গলা চড়িয়ে কথা বলে ফেলা। আবার কখনো-বা কলেজ পড়ুয়া মেয়ের কোনো আবদারে বিচ্ছিরিভাবে কোনো মন্তব্য করে দেওয়া। পরে এমন ব্যবহারের জন্য নিজেরই ভীত বা খারাপ লাগতে শুরু করে। কিন্তু মৌ কিছুতেই নিজের মেজাজটা আয়ত্তে রাখতে পারছে না। অথচ মৌকে সকলেই খুবই হাসিখুশি নরম স্বভাবের মেয়ে বলে জানত। সেই মৌ যেন কীরকম সবকিছুতেই অধৈর্য খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

মৌ বুঝতে পারে, তার এই শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন সবাইকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। বললেও যে সকলে বুঝবে তাও নয় হঠাৎ এক একদিন অফিসের এসি-র ঠান্ডার মধ্যে মৌ কুলকুল করে ঘামতে থাকে। এটাকেই ডাক্তাররা বলেন 'হটফ্লাশ'। মেনোপজের সময় এগিয়ে আসতে থাকলেই এই 'হটফ্লাশ' হয়। হঠাৎ প্রচণ্ড ঘামতে থাকে মৌ। কিছু ভালো লাগে না তখন। ছুটে ওয়াশরুমে গিয়ে চোখে-মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা। খুব যে কাজ দেয় তা নয়। এইভাবে এক অদ্ভুত লড়াই করে প্রতিদিন বেঁচে থাকে। আশেপাশের মানুষগুলো কিন্তু ভাবে মৌ তো সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনই কাটাচ্ছে। হয়তো কিছুই ভাবে না।

এইরকম অবস্থার জন্য কোনো কোনো দিন মৌ অফিসেও আসতে পারে না। কিন্তু কারণটা বোঝানোও এক সমস্যা। পুরুষ বসকে কারণ বলা এবং তার পক্ষে সেটা বোঝা—দুটোই বেশ কষ্টকর। মৌ বোঝে এদেশে মহিলাদের শারীরিক সমস্যাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে ধরার মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি। আর তাতে মানসিকভাবে আরও ভেঙে পড়ে সে। তাই অফিসে না আসতে পারলে 'শরীর খারাপ' এই কথা বলে ছুটি চেয়ে নেয়। চল্লিশ বছরের শেষ প্রান্তের এক মহিলার যে একেবারে অন্যরকম শারীরিক সমস্যা হচ্ছে, সেটা যে কেয়ার করার মতো, এমন ধারণা এখনও এদেশে তৈরি হয়নি।

এক অদ্ভুত চড়াই-উৎরাইয়ের পথ ভেঙে মৌ এগিয়ে চলেছে। এই তো সেদিন কেনাকাটার জন্য বিকেলের দিকে একটু নিউমার্কেটে ঢুঁ মেরেছিল। কিন্তু ভিড় দেখে কীরকম শরীর খারাপ করতে লাগল তার। এই ভিড় ঠেলে কেনাকাটা করা প্রায় অসম্ভব। মার্কেটের ভিতর থেকে কোনো মতে বেরিয়ে চলে এসেছিল সেদিন।

সব সময় একটা অজানা আশঙ্কায় ভোগে মৌ, মৌয়ের মেয়ে যখন বেশ ছোটো তখন থেকেই চাকরির কারণে বারবারই কলকাতার বাইরে মৌকে যেতে হয়েছে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির কাছেই মেয়ে থেকেছে। দূর থেকে মন খারাপ হত মেয়ের জন্য। কিন্তু সারাক্ষণ উৎকণ্ঠায় ভোগেনি। এখন মৌ কলকাতাতেই রয়েছে। মেয়ে কলেজে যায়। এমনও হয় অফিসে বসেই মনে হয় মেয়ে কী করছে? কিছু হয়নি তো মেয়ের? পরে হয়তো নিজেকে বোঝায় এই ভাবনাগুলো অর্থহীন। কিন্তু মন মানে না। ডাক্তার বলেছেন, ধীরে ধীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন কমে আসছে মৌয়ের শরীরে। আর এই সময়ই শারীরিক মানসিক এমন বদল ঘটে যাচ্ছে।

মৌ বুঝতে পারে গায়ের চামড়াও কীরকম যেন বদলে যাচ্ছে। ঈষৎ খসখসে। আর এর থেকে তৈরি হচ্ছে মানসিক চাপ। আশেপাশের মানুষগুলোর কাছেও কি মৌ বদলে যাচ্ছে? হয়তো না। কিন্তু মৌ যুক্তি দিয়ে এটা মানতে পারে না। সকালবেলা যখন নিজের শরীরটা বিছানা থেকে টেনে কিছুতেই তুলতে পারে না, তখন কেবলই মনে হয় এই দুনিয়ার থেকে সে আলাদা। সকলেই নিজেদের জীবন একটা ছন্দে সুন্দরভাবে কাটাচ্ছে। সেই শুধু পারছে না। হয়তো তা নয়। সকলের জীবনেই সমস্যা আছে। মৌ বুঝতে চায় না।

হয়তো একদিন ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। মৌয়ের এই শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখনকার এই উথালপাথাল অবস্থারও বদল ঘটে যাবে। সবকিছুই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু চলতি সময় বড়ো কঠিন। কষ্টেরও কি নয়? জীবনের চেনা ছন্দ থেকে হঠাৎ যেন পিছলে পড়ে যাওয়া। আবার উঠে দাঁড়াতে চরম লড়াই। আর সে লড়াইয়ে নিজেকে বড্ড একা লাগা। হয়তো চারপাশে সকলেই আছে। হয়তো তারা মৌকে নিয়ে ভাবে কিন্তু মৌয়ের এই খাদের ভেতর চলে যাওয়ার যে অনুভূতি তাকে বোধহয় স্পর্শ করতে পারে না কেউ। মৌয়ের মনে আছে মা এই বয়সটাতে বলত, ''শরীরটা ভালো লাগে না রে।' মৌ কিছু বুঝত না। মনে হত গা ম্যাজম্যাজ করা, মাথা ধরা—এ আর এমন কী! কোনোদিনও জানতে চায়নি মায়ের সত্যি কীরকম লাগে। আজ যেমন মৌয়ের মনে হয়। কেউ তাকে একটু বেশি কেয়ার করুক। অফিস যেতে কেন পারছে না। সেটা বস নিজেই বুঝে যাক। হয়তো একদিন এই মেনোপজ নিয়ে অনেক বেশি সচেতনতা তৈরি হবে। কিন্তু এখনও সচেতনতার বড়ো অভাব। শুধু ওষুধপত্র নয়, মেনোপজের সময় মেয়েদের যে একটু বেশি কেয়ার লাগে। লাগে সহানুভূতি। সেই বিষয়টি বোঝা খুব দরকার। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখিকা প্রাবন্ধিক।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি

ডাক্তারি শাস্ত্রে বেশ কিছু রোগের কথা বলা আছে যাদের সঠিক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগজনিত উপসর্গের কিছুটা উপশম সম্ভব হলেও রোগের সম্পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব নয়। রোগ এক হলেও তা বিভিন্ন রোগীকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এরকমই একটা রোগ। এটা কোনো মারণ রোগ নয়, তবে এ রোগের কারণে কিছু কিছু সুদূরপ্রসারী সমস্যা আসতে পারে।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (PCOS বা পিসিওএস) সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে আমরা পলিসিস্টিক ওভারি বলতে কী বুঝি। 'পলি' (Poly) শব্দের অর্থ অনেক। 'সিস্ট' (Cyst) শব্দের অর্থ জলভরা ছোটো থলি। মেয়েদের ওভারিতে অনেকগুলি ছোটো ছোটো থলি থাকলে তাকে বলা হয় পলিসিস্টিক ওভারি। এই সিস্টগুলি আসলে অপরিণত ফলিক্‌ল (Follicle বা ডিম্বাণু কক্ষ) ছাড়া আর কিছুই নয়। সিস্ট

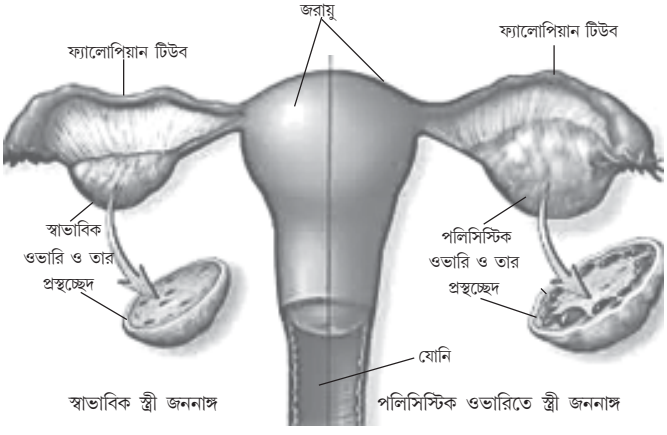

চিত্র ১. সাধারণ ওভারি ও পলিসিস্টিক ওভারি

শব্দটি শুনলেই অনেকে টিউমার বা ক্যানসারের কথা ভাবেন, কিন্তু পিসিওএস সেই গোত্রের কোনো রোগ নয়।

পিসিওএস (PCOS) কী?

পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত (Interrelated) কতকগুলো সমস্যার সমাহারকে সাধারণভাবে সিনড্রোম বলা হয়। অনিয়মিত ঋতুচক্র, শরীরে অত্যধিক লোম এবং ওভারিতে অনেকগুলি সিস্ট—এইসব উপসর্গ লক্ষণ-শারীরিক অস্বাভাবিকত্বকে একত্রিত করে রোগের নামকরণ করা হয়েছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সি মেয়েদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ১০ থেকে ২০ শতাংশের এই সমস্যা দেখা দেয়। কারও কম সমস্যা, কারও বেশি।

কারণ অজানা

ঠিক কী কারণে পিসিওএস হয় সে সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সন্দিহান। অনেক সময় একই পরিবারে একাধিক সদস্য একই সমস্যায় ভোগেন বলে একটি বংশগত যোগসূত্র (Genetic Link) আছে এমনটা ভাবা হয়। কারণ যাই হোক না কেন, উপসর্গগুলি হয় কিছু হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য। স্বাভাবিক নিয়মে ওভারি থেকে স্ত্রী হরমোন (Female Sex Hormone) বেরোনোর পাশাপাশি সামান্য পরিমাণে পুরুষ-হরমোনও (Male Sex hormone) বেরোনোর কথা। ধরে নেওয়া হয়, পিসিওএস রোগীদের ওভারি থেকে পুরুষ হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি নিঃসৃত হয় এবং তার ফলেই অনিয়মিত ঋতুচক্র, শরীরে লোমের আধিক্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। তবে হরমোন-উবাচ এখানেই শেষ নয়। পিসিওএস রোগীরা ইনসুলিন (Insulin) নামক হরমোনের প্রতিও যথাযথ সাড়া দেন না। এই পরিস্থিতিকে ইনসুলিন প্রতিরোধী অবস্থা (Insulin Resistance) বলা হয়। ইনসুলিন হরমোন আমাদের শরীরে শর্করা-মাত্রা (ব্লাড সুগার লেভেল) নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে পিসিওএস থাকলে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

রোগ নির্ণয়

পলিসিস্টিক ওভারি (পিসিও) থাকলেই যে পিসিওএস রোগটা থাকবে তা নয়। নিম্নলিখিত তিন ধরনের সমস্যার মধ্যে অন্তত দু-টি থাকলে তবেই পিসিওএস ডায়াগ্‌নসিস্ করা হয়।

- অনিয়মিত, বেশিদিন অন্তর রজঃস্রাব, বা রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া;
- শরীরে অত্যধিক লোম গজানো অথবা রক্তে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুরুষ হরমোন থাকা;
- আলট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় ওভারিতে অনেক সিস্ট দেখতে পাওয়া।

অর্থাৎ পিসিওএস হয়েছে এটা বলতে গেলে রোগিণী সম্পর্কে চিকিৎসককে বিশদ জানতে হয়, রক্ত পরীক্ষা ও আলট্রাসোনোগ্রাফিরও প্রয়োজন হতে পারে।

> ইঞ্জেকশন দিলে সাধারণত সারা শরীরেই ওষুধটা ছড়িয়ে পড়ে, মলমে কেবল দরকারের জায়গায়।

অনিয়মিত ঋতুচক্র

অনেক ক্ষেত্রেই পিসিওএস ধরা পড়ে অনিয়মিত ঋতুচক্রের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে। অন্তত পক্ষে ৭৫ শতাংশ পিসিওএস রোগীর এই সমস্যা থাকে। আবার অনিয়মিত ঋতুচক্র প্রকারান্তরে অনিয়মিত ডিম্বাণু স্খলনের (Ovulation) পরিচায়ক—অর্থাৎ যথাসময় ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে বেরিয়ে আসে না। অতএব পিসিওএস রোগীদের সন্তান ধারণেরও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বন্ধ্যাত্বের সম্ভাব্য কারণ

ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ। প্রথমে ডিম্বাশয়ের

মধ্যে প্রথমে একটি ছোট্ট জল-ভরা থলি (Fluid-filled sac) তৈরি হয়। এটাকে বলা হয় ফলিক্‌ল (Follicle)। এই ফলিক্‌ল সম্পূর্ণ পরিণত হতে কয়েকদিন সময় লাগে। তারপর সেই পরিণত (ম্যাচিয়োরড) ফলিক্‌ল থেকে একটি ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়।

পিসিওএস রোগীদের ক্ষেত্রে এই ফলিকল পরিণতি প্রাপ্তির পদ্ধতিতে সমস্যা হয়। ফলে, সেগুলি অপরিণত অবস্থায় থেকে যায় এবং ডিম্বাণু নিঃসৃত হতে পারে না। আর এই অপরিণত ফলিকল্‌গুলিই আলট্রা-সোনোগ্রামে (ইউএসজি) সিস্ট হিসাবে দেখা যায় এবং ডিম্বাশয়গুলি 'বহু-থলিবিশিষ্ট' ('পলিসিস্টিক') চেহারা নেয়।

চিত্র ২. মেয়েদের মুখে অতিরিক্ত লোম

বন্ধ্যাত্বের হাজারো কারণ থাকতে পারে, তবে ডিম্বাণুর অনিয়মিত নিঃসরণ একটি সহজপ্রাপ্য কারণ। আশার, কথা পিসিওএস-জনিত বন্ধ্যাত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসাযোগ্য। জীবনশৈলীর কিছু পরিবর্তন ও সাধারণ কিছু ওষুধপত্রের ব্যবহারে অনেকে সাফল্য লাভ করেন।

পুরুষ-সুলভ লোম গজানো, তেলতেলে ত্বক ও ব্রণ

ডিম্বাশয় থেকে পুরুষ-হরমোন (টেস্টোস্টেরন) স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি মাত্রায় বেরোনোর কারণে মুখে, তলপেটে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে বেশি লোম দেখা দিতে পারে। এই লোমগুলি একটু গাঢ় এবং পুরুও (coarse) হতে পারে---- যেমনটা পুরুষ-মানুষের হয়ে থাকে।

একই কারণে মুখে অত্যাধিক ব্রণ এবং তৈলাক্ত ত্বক দেখা দিতে পারে। যদিও এই সব উপসর্গ শারীরিক কষ্ট বিশেষ দেয় না, কিন্তু অনেকেই এর ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারেন। এই সমস্ত উপসর্গের সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব না হলেও সমস্যাগুলোকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

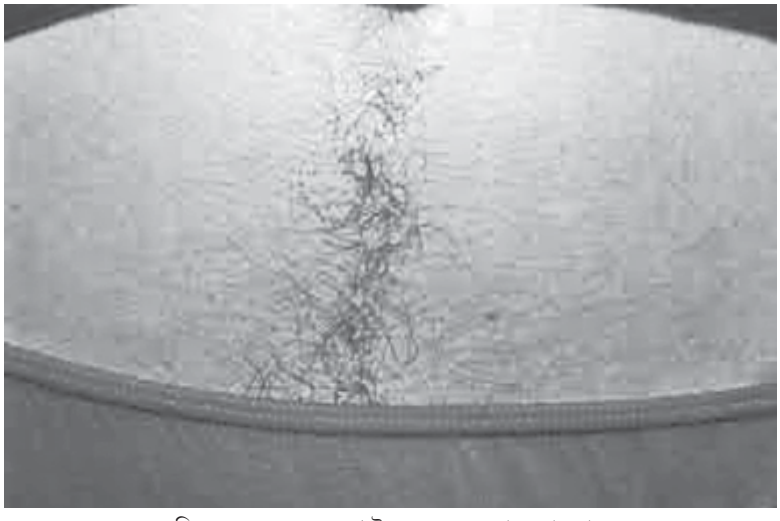

চিত্র ৩. মেয়েদের তলপেটে ছেলেদের মতো বড়ো লোম

স্থূলত্ব (Obesity) বা ওজন বেড়ে যাওয়া

অধিকাংশ পিসিওএস রোগীরই শরীরের ওজন বেশির দিকে হয়। এর একটা বড়ো কারণ হল ইনসুলিন প্রতিরোধ, যা নিয়ে প্রথম দিকে আমরা আলোচনা করেছি। ইনসুলিন একটি অ্যানাবলিক হরমোন এবং এটি বাড়লে শরীরের ওজন বাড়তে থাকে। আর শরীরের ওজন যত বাড়তে থাকে অনিয়মিত ঋতুচক্র, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলোও তত বাড়তে থাকে। মজার ব্যাপার হল, পিসিওএস রোগী যদি নিজের শরীরের ওজন আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন, তার সমস্যাও অনেক কমে যায় এবং চিকিৎসকের কাজও সহজ হয়ে যায়।

সুদূরপ্রসারী সমস্যা (Long term risk)

দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলি মূলত অধিক ইনসুলিন হরমোন ও অধিক টেস্টোরেন হরমোনের কারণে ঘটে থাকে। যে সমস্ত পিসিওএস রোগীর শরীরের ওজন বেশি, তাদের এক তৃতীয়াংশের ৪০ বছর বয়সের মধ্যে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। প্রশ্ন হল, শরীরের ওজন বেশি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? এটি বুঝতে হলে আপনাকে দেহভর সূচক বা বি এম আই (BMI-Body Mass Index) বিষয়টি বুঝতে হবে। শরীরের ওজনকে (কিলোগ্রামে) যদি (মিটারে) শরীরে উচ্চতার বর্গ (Square) দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে বি এম আই পাওয়া যায়। অর্থাৎ কারও ওজন যদি ৬০ কিলোগ্রাম হয় এবং উচ্চতা হয় ১.৬ মিটার, তাহলে তাঁর বি এম আই হবে ৬০/১.৬ × ১.৬ = ২৩.৪ কিলোগ্রাম/বর্গমিটার। ধরে নেওয়া হয় ১৯ থেকে ২৪ হল স্বাভাবিক বি এম আই। এর কম হলে তাকে কম ওজন (underweight) এবং বেশি হলে তাকে বেশি ওজন (overweight) বলা হয়। পিসিওএস রোগীর পক্ষে ওজন কমানো অন্যদের চেয়ে কঠিন হতে পারে তবে নিজেই নিজেকে সারিয়ে তোলার (self help) চেয়ে ভালো আর কিছু নেই।

চিকিৎসা

আগেই বলেছি পিসিওএস-এর সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না তবে সমস্যাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনিয়মিত ঋতুচক্রের সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা যায় সামান্য কিছু ওষুধের সাহায্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসক এমন কিছু হরমোন

পিল ব্যবহার করেন যাতে এই সমস্যা মেটে ও তার সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণ হয় এবং পিসিওএস-জনিত ত্বকের সমস্যাও অনেকটা মেটে। ত্বকের সমস্যা সমাধানের জন্য ত্বক-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই আপনার হরমোন বিশেষজ্ঞ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সন্তানধারণে বিলম্ব হলেও ঘাবড়ে যাবার কোনো কারণ নেই। সাধারণ ওষুধপত্রে অনেকেরই সাফল্য আসে। আর তা না হলে উচ্চপ্রযুক্তির চিকিৎসা যেমন ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF), বা চলতি কথায় টেস্টটিউব বেবি, তো রয়েছেই। এতে সাফল্যের হার যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

অপরিণত ফলিকল্‌গুলিই আলট্রাসোনোগ্রামে (ইউএসজি) সিস্ট হিসাবে দেখা যায় এবং ডিম্বাশয়গুলি ‘বহু-থলিবিশিষ্ট’ (‘পলিসিস্টিক’) চেহারা নেয়।

শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন

পিসিওএস-এর চিকিৎসার দিক নির্দেশিত হয় রোগীর সমস্যার ওপর ভিত্তি করে। ঋতুচক্রের সমস্যা হলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, ত্বকের সমস্যা হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ডায়াবেটিস হলে তার বিশেষজ্ঞ আপনাকে পেশাদারি পরামর্শ দিতে পারেন। তবে নিজেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন আপনি নিজেই, একটু আগেই স্বাভাবিক বি এম আই-এর কথা বলেছি। আর সেটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার চিকিৎসকের কাজ সহজ করে ফেলছেন, এবং আখেরে আপনারই উপকার। ওজন কমানো কারও পক্ষেই সহজ কাজ নয়। পিসিওএস-এর জন্য কাজটা আরও কঠিন হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি ৫ শতাংশ ওজনও কমাতে পারেন, আপনার ডিম্বাণু নিঃসরণ আরও নিয়মিত হবে, ত্বকের সমস্যাও কমবে। পিসিওএস না থাকলেও স্থূলত্ব এমনিতেই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির কারণ হতে পারে। সেই সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি রোগ থেকেও আপনি মুক্তি পেতে পারেন। ওজন কমানোর পরামর্শ পথ-ঘাট, ইন্টারনেট সব জায়গা

অনিয়মিত ঋতুচক্রের সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা যায় সামান্য কিছু ওষুধের সাহায্যে।

উপচে পড়ে। অতি সরলীকরণ মনে হলেও মূল স্তম্ভ দু-টি। পরিমিত খাওয়া (Diet) আর যথেষ্ট পরিমাণে খাটা (Exercise)। এই জমা-খরচের হিসাবটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেই শরীরে আর মেদ সঞ্চয় হবে না। এই তো মোদ্দা কথা।

শেষের কথা

পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম রোগটি সম্পর্কে আমাদের যত তথ্য জানা আছে তার চেয়েও বেশি তথ্য এখনও আমাদের অজানা। তাবড়ো বিশেষজ্ঞরাও এখনও এটিকে একটি গোলকধাঁধা বলে মনে করেন। রোগটির চিকিৎসায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একসঙ্গে কাজ করলে (Multi-disciplinary approach) বোধহয় ফল সবচেয়ে ভালো হয়। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, হরমোন বিশেষজ্ঞ, ডায়েটিশিয়ান, ত্বক বিশেষজ্ঞ সবার অবদান এখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এত জনকে একসূত্রে বাঁধা হয়তো কঠিন কিন্তু আদর্শ পরিস্থিতিটা জানতে ক্ষতি কী? তবে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কিন্তু রোগীর নিজের হাতে। তা হল শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফ আর সি ও জি, ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে জি আই ও জি এল-এর যোগ কোথায়?

আজকাল খবরের কাগজ থেকে স্বাস্থ্য পত্রিকার দৌলতে কতগুলো আধা-জানা আধা-বোঝা শব্দ কানে আসে বা চোখে পড়ে—গ্লাইসেমিক ইনডেক্স, গ্লাইসেমিক লোড, আর বি এম আই। এরাই নাকি আপনার রোগা বা মোটা হবার আসল কারণ। সত্যিটা আসলে কী? আর এই কথাগুলোর মানেই-বা কী? বুঝিয়ে বলেছেন **ডা. নীলাদ্রি শেখর মিত্র।**

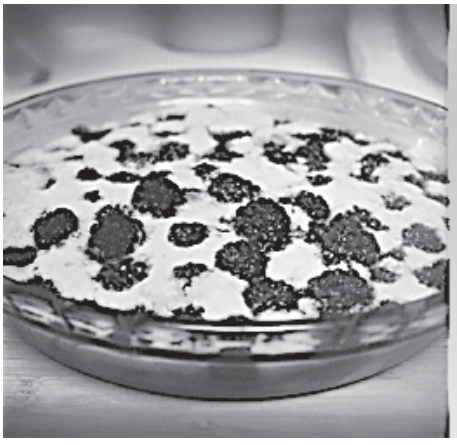

গ্লাইসেমিক ইনডেক্স
ও
গ্লাইসেমিক লোড

জি আই (GI) জি এল (GL) কী?

গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (Glycemic Index- GI) বা জি আই হল একটি সংখ্যা, যা একটি নির্দিষ্ট খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সংখ্যাটি জানায় সেই নির্দিষ্ট খাদ্য রক্তের গ্লুকোজের (শর্করার) মাত্রা কতখানি এবং কত তাড়াতাড়ি বাড়ায়। জি আই (GI) যে মাপকাঠিতে (Scale-এ) মাপা হয় তার পরিসর ০ থেকে ১০০। যেখানে বিশুদ্ধ গ্লুকোজকে একক হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ গ্লুকোজের জি আই হচ্ছে ১০০। যে খাদ্যের জি আই যত বেশি, সেই খাদ্য রক্তের গ্লুকোজ তত বেশি বাড়ায়। সাধারণভাবে ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে জি আই থাকলে সেই খাদ্যকে গড়পরতা বা গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয়। ৭০-এর বেশি জি আই হলে সেই খাদ্যের জি আই বেশি বলে ধরা হয়। ৫০-এর কম যাদের জি আই সে সমস্ত খাদ্যের রক্তে গ্লুকোজ বাড়ানোর প্রবণতা কম ধরা হয়।

জি আই-এর মুশকিলটা হল এটি খাদ্যটির পরিমাণ বা ওজনের সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় না। এটি প্রতিটি খাদ্যের ৫০ গ্রাম শর্করা ধারণের ক্ষমতাকে প্রমিত করে (standardize)। তাতে মাঝেমাঝে কিছু হাস্যকর তথ্যও উঠে আসে—যেমন ৫০ গ্রাম শর্করা পেতে গেলে আপনাকে ১০০ গ্রাম কুকিজ বা ৪৫০ গ্রাম কুমড়ো খেতে হবে, যা অনেকটাই বাস্তবসম্মত নয়।

১৯৯৭ সালে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল এই অসুবিধা দূর করার জন্য নিয়ে এলেন এক নতুন মাপকাঠি, যার নাম 'গ্লাইসেমিক লোড' (Glycemic load-GL), সংক্ষেপে জি এল।

জি আই আমাদের ধারণা দেয় কত তাড়াতাড়ি কোন খাদ্য আমাদের রক্তে শর্করা বাড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকবার গড়ে যতটা খাবার দেওয়া হয় (average serving), তার থেকে কতখানি গ্লুকোজ আমরা পাচ্ছি তার ধারণা পাওয়ার জন্য 'গ্লাইসেমিক লোড' (জি এল) জানা দরকার। জি এল হল একটি নতুন উন্নততর এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যাতে শর্করা গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে আরও বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ করা যায়। শুধুমাত্র গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জি আই আমাদের যে তথ্য দেয়, জি এল-এর তথ্যে তার থেকে বেশি পূর্ণতা মেলে। কারণ জি এল খাদ্যের শর্করার গুণগত এবং পরিমাণগত মূল্যায়ন (Qualitative and quantitative assessment) করে। অঙ্কের ভাষায় বলতে গেলে—জি এল = ১০০ গ্রাম খাদ্যে কত গ্রাম গ্লুকোজ × জি.আই/১০০। যেমন ধরা যাক তরমুজের কথা। তরমুজের জি আই হচ্ছে ৭২। জি আই-এর হিসাবে এটা বেশ বেশি। কিন্তু তরমুজের একটা ১০০ গ্রাম টুকরোতে গ্লুকোজ থাকে মাত্র ৫ গ্রাম। তাহলে তরমুজের জি এল হবে ৫×৭২/১০০ = ৩.৬ যা জি এল-এর হিসেবে খুবই কম।

২০-র ওপর জি এল থাকলে তাকে 'বেশি' বলা হবে, ১১ থেকে ১৯-এর মধ্যে হলে হবে 'মাঝামাঝি' ১০ বা তার নীচে হলে হবে 'কম'। **দৈনন্দিন জীবনে গৃহীত কিছু ফলের জি আই ও জি এল এবং গড় পরিবেশিত ওজন (Average Serving Size-একবারে গড়ে যতটা খাবার দেওয়া হয়)**

ফল	জি আই	জি এল	গড়ে একবারে যতটা খাবার দেওয়া হয় (গ্রাম)
১. আপেল	৩৮	৬	১২০
২. আপেল জুস্	৪০	১১	২৫০
৩. অ্যাপ্রিকট্	৩১	৯	১২০
৪. কলা	৪০	১১	১২০
৫. খেজুর	১০৩	৪২	৬০

৬. আঙুর	৫৬	১১	১২০
৭. পেয়ারা	৪৬	৪	১২০
৮. লিচু	৭৯	১৬	১২০
৯. পাকা আম	৫১	৮	১২০
১০. কমলা লেবু	৪২	৪	১২০
১১. নাশপাতি	৩৮	৪	১২০
১২. আনারস	৫৯	৬	১২০
১৩. কিসমিস	৬৪	২৮	৬০
১৪. স্ট্রবেরি	৪০	১	১২০
১৫. তরমুজ	৭২	৪	১২০
১৬. টমেটো জুস্	৩৮	৪	২৫০

ভারতীয় তথা বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যের জি আই, জি এল

ফল	জি আই	জি এল	গড়ে একবারে যতটা খাবার দেওয়া হয় (গ্রাম)
১. ভাত (রত্না)	৬৪	২৩	১৫০
২. ভাত (বাঁশকাঠি)	৫৬	২৩	১৫০
৩. ভাত (বাসমতি)	৬৭	৪০	৭৫
৪. আটা রুটি	৭০	৭.৭	২৮
৫. ময়দা রুটি	৭০	৮.৪	২৮
৬. পাউরুটি	৭৩	১০	৩০
৭. কর্নফ্লেক্স	৮১	২১	৩০
৮. মুসুর ডাল	২৬	৫	১৫০
৯. মুগ ডাল	৪২	৭	১৫০
১০. মটরশুঁটি	২২	২	১৫০
১১. ছোলার ডাল	৫	১	৫০
১২. সোয়াবিন	১৫	১	১৫০
১৩. আলু	৯০	১৬	১৫০
১৪. মিষ্টি আলু	৯২	২১	১৫০
১৫. দুধ	৩১	৪	২৫০
১৬. দই	৩৩	১১	২০০
১৭. বাদাম	১৩	১	৫০
১৮. কাজু	২২	৩	৫০
১৯. চাউমিন	৫০	২৪	১৮০
২০. পিৎজা	৪০	২২	১০০
২১. মধু	৬১	১২	২৫
২২. অরেঞ্জ ড্রিঙ্ক	৬৮	২৩	২৫০
২৩. কোকা কোলা	৬৩	১৬	২৫০

আমিষ খাবার অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি মূলত আমাদের খাদ্যের প্রোটিন-এর উৎস। তাছাড়াও এদের থেকে কিছু স্নেহপদার্থ ও খনিজপদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু শর্করার উৎস হিসেবে এদের তেমন ভূমিকা নেই। তাই জি আই, জি এল তালিকাতে এদের স্থানও নেই।

বি এম আই (BMI) কী?

বডি মাস ইনডেক্স (Body Mass Index-BMI) বা দেহভর সূচক, সংক্ষেপে 'বি এম আই', অথবা Quetelet Index হল স্থূলতা পরিমাপক একটি সংখ্যা। Adolf Quetelet সাহেব হলেন বি এম আই-এর প্রবক্তা, তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ। বি এম আই-এর ওপর ভিত্তি করে আমরা একজন মানুষকে রোগা (underweight), স্বাভাবিক ওজনের (normal weight) বা মোটা (overweight বা obese) এই তিন ধরনের শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি।

কীভাবে বি এম আই পরিমাপ করা হয়? সহজ একটি সূত্রের সাহায্যে এটা মাপা যায়—এর সাহায্যে যে কেউই তার বি এম আই ঘরে বসেই পরিমাপ করে ফেলতে পারে। সূত্রটি হল—

$$\text{BMI} = \frac{\text{Mass (in kg)}}{[\text{Height}]^2 \text{ (in meter)}}$$

$$\text{অর্থাৎ বি এম আই} = \frac{\text{ওজন (কিলোগ্রামে)}}{\text{উচ্চতার বর্গ (মিটারে)}}$$

২৫-এর ওপর বি এম আই থাকলে বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সেই সমস্ত ব্যক্তির ডায়বেটিস, স্ট্রোক, হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধির প্রবণতা বাড়ে। তাই এই সতর্কতা।

বি এম আই প্রাইম (BMI Prime) কী?

বি এম আই প্রাইম হল কোনো ব্যক্তির বি এম আই এবং স্বাভাবিক বি এম আই-এর উচ্চসীমার (২৫) মধ্যেকার অনুপাত। বি এম আই প্রাইম এককবিহীন একটি সংখ্যা।

বি এম আই প্রাইম ০.৭৪ এর নীচে—রোগা

বি এম আই প্রাইম ০.৭৪ থেকে ১-এর মধ্যে—স্বাভাবিক

বি এম আই প্রাইম ১-এর বেশি—বেশি ওজন/স্থূল/মোটা।

বি এম আই প্রাইমের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে ঠিক কতটা রোগা বা মোটা বলা হবে তার একটা সারণি নীচে দেওয়া হল।

শ্রেণি	বি এম আই (কিলোগ্রাম/বর্গমিটার)		বি এম আই প্রাইম	
	থেকে	পর্যন্ত	থেকে	পর্যন্ত
খুব অতিরিক্ত ওজন	-	১৫	-	০.৬০
অতিরিক্ত ওজন	১৫	১৬	০.০৬	০.৬৪
কম ওজন	১৬	১৮.৫	০.৬৪	০.৭৪
স্বাভাবিক	১৮.৫	২৫	০.৭৪	১.০
বেশি ওজন	২৫	৩০	১.০	১.২
প্রথম স্তরের স্থূল/মোটা	৩০	৩৫	১.২	১.৪
দ্বিতীয় স্তরের স্থূল/মোটা	৩৫	৪০	১.৪	১.৬
তৃতীয় স্তরের স্থূল/মোটা	৪০	-	১.৬	-

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের স্থূলকায় (Class 1, 2, 3 obese) মানুষদের নিম্নলিখিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

CHD (করোনারি ধমনির রোগ)

Dyslipidemia (রক্তের স্নেহপদার্থ বাড়া)

Diabetes Type 2 (মধুমেহ)।

Gall Bladder disease (পিত্তথলির রোগ)

Hypertension (উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ)

Osteoarthritis (গেঁটে বাত)

Sleep apnoea (ঘুমের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস সাময়িক বন্ধ হওয়া)

Stroke (মস্তিষ্কের স্ট্রোক)

Endometrial, breast, colon cancer (জরায়ুর বিশেষ অংশ, স্তন ও বৃহদান্ত্র—এদের ক্যানসার)

১৮.৫-এর নীচে বি এম আই থাকলে সেই ব্যক্তি অপুষ্টিজনিত নানা রোগ, হাড়ের ভঙ্গুরতা (Osteoporsis) ইত্যাদি রোগের শিকার হতে পারেন।

এখন জানা দরকার বি এম আই-এর সঙ্গ জি আই বা জি এল-এর সম্পর্ক কী? সমীক্ষায় দেখা গেছে যে খাদ্য একজন খান তার জি আই এবং বিশেষত জি এল, সেই ব্যক্তির বি এম আই-এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। স্বাভাবিক ওজন, বেশি ওজন এবং স্থূল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বি এম আই হল জি এল-এর সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ খাদ্যের জি এল স্থায়ীভাবে বাড়লে বি এম আইও বাড়বে এবং স্থূল হওয়ার প্রবণতাও বাড়বে।

[B. Richelsen এবং K. Borch–Johson-এর ২০০৬ সেপ্টেম্বর-এর ৬৩৩৪ জন ৩০-৬০ বছর বয়সের সুস্থ মানুষের ওপর প্রস্থচ্ছেদিক (cross sectional) বিশ্লেষণ-এর ফল অনুযায়ী লিখিত। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. নীলাদ্রি শেখর মিত্র, এমবিবিএস, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

টুকরো খবর

ক্যালশিয়াম বড়ি আপনার হার্টের ক্ষতি করতে পারে

আমেরিকার জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর করা এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে—ট্যাবলেট সিরাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়াম খাওয়া ধমনির মধ্যে চাপড়া সৃষ্টি করে হৃদ্‌যন্ত্রে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল কমিয়ে দিতে পারে, ফলে আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক খাদ্যে যে ক্যালশিয়াম আছে সেটা এরকম ক্ষতি করে বলে প্রমাণ নেই।

এই সমীক্ষায় ২৭০০ মানুষকে ১০ বছর ধরে দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। যে গবেষণাপত্রটি একথা বলেছে, তার সিদ্ধান্ত হল, খাদ্যে কৃত্রিমভাবে নানা পুষ্টিদ্রব্য যোগ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতি হচ্ছে, আর এটা তারই এক উদাহরণ।

অবশ্য এটাও বলা দরকার, এই সমীক্ষাই একমাত্র নয়, শেষকথাও নয়। এর আগে করা কিছু সমীক্ষা ও পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কৃত্রিমভাবে পুষ্টিদ্রব্য হিসেবে ক্যালশিয়াম যোগ করে হৃদ্‌যন্ত্র ও শিরা-ধমনি তন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে—এই সমীক্ষা সে ব্যাপারে আরও তথ্য যোগ করল।

অন্য পুষ্টিবিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। যেমন আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রখ্যাত পুষ্টিবিজ্ঞানী জানিয়েছেন, ক্যালশিয়াম বড়ি-সিরাপ বা কৃত্রিমভাবে ক্যালশিয়াম যোগ করা খাদ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেশি দেওয়া হয়, ভাবা হয় তা হাড়ের ক্ষয় (অস্টিও-পোরোসিস) আটকাবে। কিন্তু এইভাবে দেওয়া ক্যালশিয়ামের অনেকটাই হাড়ে জমা হয় না, আর কিডনিও একে সম্পূর্ণ বের করে দিতে পারে না। সুতরাং এটা দেহের অন্য কোষকলায় (যেমন ধমনির গায়ে) জমা হয়।

বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানেন, মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ধমনির ভেতরের দিকে 'চাপড়া' (plaque) জমা হয়। কোলেস্টেরল বৃদ্ধি এর জন্য অনেকটাই দায়ী। কিন্তু তারপর সেই চাপড়ার মধ্যে ক্যালশিয়াম এসে সেটা আরও শক্ত হয়ে যায়, রক্ত চলাচলে বেশি বাধা পড়ে, আর তাতে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে।

জন হপকিন্স-এর এই গবেষকরা অনেকগুলো মনুষ্যগোত্রের (কালো, বাদামি, সাদা, এশিয়ান, ইউরোপীয়ান ইত্যাদি নানা মানুষ) বিভিন্ন বয়সি (৪৫ থেকে ৮৪ বছর, তার অর্ধেক মহিলা) নিয়ে গবেষণাটি করেছেন। ২০০০ সালে সমীক্ষার শুরু হয়। তখন থেকে মোট ২৭৪২ জন মানুষের ১০ বছর অন্তর দু-টি সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, আর তাঁদের খাদ্যাভ্যাস খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে যাতে তাঁরা ক্যালশিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য কতটা খেয়েছেন আর ওষুধ হিসেবে ক্যালশিয়াম কতটা খেয়েছেন সে সব জানা যায়।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৩ অক্টোবর ২০১৬, ইন্টারনেটে http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Calcium-supplements-may-damage-your-heart-Study/articleshow/54808568.cms-এ লভ্য। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

নিষিদ্ধ ডায়াবেটিসের ওষুধ

১০ মার্চ, ২০১৬ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক যে ৩৩৭টি মিশ্রণ ওষুধকে নিষিদ্ধ করেছে তার মধ্যে ডায়াবেটিসে ব্যবহৃত মুখে খাওয়ার ওষুধের মিশ্রণ ২৬টি। এইবার সেই ওষুধগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

আলোচনার শুরুতে মনে করে নেওয়া যাক—ডায়াবেটিস প্রধানত দুই ধরনের—টাইপ ১ এবং টাইপ ২। টাইপ ১ সাধারণত কম বয়সিদের হয়, এঁদের অগ্ন্যাশয়ের আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন ক্ষরণ হয় না। টাইপ ২ ডায়াবেটিস সাধারণত হয় বেশি বয়সিদের, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই মোটা, এঁদের ইনসুলিন ক্ষরণ ঠিকঠাক হয়, কিন্তু ইনসুলিন এঁদের শরীরে ঠিকমতো কাজ করতে পারে না।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করা হয় ইনসুলিন দিয়ে, আর টাইপ ২-এর চিকিৎসা শুরু করা হয় মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে। কোন ওষুধ কীভাবে কাজ করে তা এই পত্রিকার বর্তমান আলোচনার আওতার বাইরে। তবুও জেনে রাখা যাক—ডায়াবেটিসে মুখে খাওয়ার প্রধান ওষুধ দুই ধরনের—সালফোনিলইউরিয়া (sulphonylureas) এবং বাইগুয়ানাইডস (biguanides)। এছাড়া থায়াজোলিডিনেডিওন (thiazolidinedione), মেগ্লিটিনাইড (meglitinide), আলফা-গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর (alpha-glucosidase inhibitor) ইত্যাদিও ডায়াবেটিসে মুখে খাওয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সালফোনিলইউরিয়াগুলির মধ্যে যেগুলি এখন ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল—গ্লিবেনক্ল্যামাইড (glibenclamide), গ্লাইক্লাজাইড (gliclazide), গ্লিপিজাইড (glipizide) এবং গ্লিমেপিরাইড (glimepiride)। বাইগুয়ানাইডস-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় মেটফরমিন (metformin)। থায়াজোলিডিনেডিওন-গুলির মধ্যে ব্যবহৃত পায়োগ্লিটাজোন (pioglitazone), যদিও সরকার কয়েক বছর আগে এই ওষুধটি নিষিদ্ধ করেছে মূত্রথলির ক্যানসারের সঙ্গে ওষুধটির সম্পর্ক থাকায়। মেগ্লিটিনাইডগুলির মধ্যে আছে রেপাগ্লিনাইড (repaglinide) এবং ন্যাটেগ্লিনাইড (nateglinide)। আলফা-গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর হল অ্যাকারবোস (acarbose), ভোগ্লিবোস (voglibose)।

নিষিদ্ধ মুখে খাওয়ার ডায়াবেটিসের ওষুধ মিশ্রণগুলির মধ্যে—

- মেটফরমিন, পায়োগ্লিটাজোন এবং গ্লিমেপিরাইডের মিশ্রণ সাতটি।
- গ্লাইক্লাজাইড ও মেটফরমিনের মিশ্রণ দু-টি।
- মেটফরমিন ও পায়োগ্লিটাজোনের মিশ্রণ তিনটি।
- চারটি মিশ্রণে ডায়াবেটিসের অন্য ওষুধের সঙ্গে ক্রোমিয়াম যৌগ আছে।
- মেটফরমিনের সঙ্গে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ওষুধ অ্যাটরভাস্টেটিনের মিশ্রণ একটি।
- মেটফরমিন, গ্লাইক্লাজাইড ও পায়োগ্লিটাজোনের মিশ্রণ একটি।
- ভোগ্লিবোস, পায়োগ্লিটাজোন এবং মেটফরমিনের মিশ্রণ একটিতে।
- একটিতে মেটফরমিনের সঙ্গে আছে ব্রোমোক্রিপ্টিন।
- একটিতে মিথাইলকোবালামিন অর্থাৎ ভিটামিন বি$_{১২}$ আছে মেটফরমিন ও গ্লিমেপিরাইডের সঙ্গে।
- পায়োগ্লিটাজোন এবং মেটফরমিনের মিশ্রণ তিনটি।
- গ্লিপিজাইড ও মেটফরমিন আছে একটিতে।
- মেটফরমিন, গ্লাইক্লাজাইড ও ভোগ্লিবোস আছে একটিতে।
- গ্লিবেনক্ল্যামাইড, মেটফরমিন ও পায়োগ্লিটাজোনের মিশ্রণ একটি।
- একটি নিষিদ্ধ মিশ্রণে মেটফরমিনের সঙ্গে আছে উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ টেলমিসারটান।
- মেটফরমিনের সঙ্গে বেনফোটিয়ামিন আছে একটিতে।

কেন এগুলি নিষিদ্ধ করা হল বুঝতে গেলে মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা বিষয়ে আরও কিছু জানা দরকার।

সাধারণত স্থূল ডায়াবেটিস রোগীদের মেটফরমিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়, স্থূল নন এমন টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের শুরুতে দেওয়া উচিত সালফোনিলইউরিয়া গোত্রের ওষুধ। প্রথমে কম মাত্রায় ওষুধ দিয়ে আরম্ভ করে রক্তের শর্করা মেপে মেপে ওষুধের মাত্রা কমানো-বাড়ানো হয় অথবা নতুন ওষুধ যোগ করা হয়। মিশ্রণ ওষুধে একাধিক ওষুধ থাকে, তাই এভাবে চিকিৎসা করা যায় না, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার নীতি লঙ্ঘিত হয়।

দ্বিতীয়ত সালফোনিল ইউরিয়া দিনে একবার দেওয়া হয়, কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে মাত্রা বাড়লে দু-ভাগ করে দিনে দুইবার। মেটফরমিন

এই ওষুধগুলির মিশ্রণ হলে হয় যে ওষুধ দিনে একবার খাওয়ার সেটি দুই বা তিনবার খাওয়া হবে। অথবা যে ওষুধ দিনে দু-তিনবার খাওয়ার কথা সেটি একবার খাওয়া হবে।

কিন্তু দিতে হয় দুইবার বা তিনবার। পায়োগ্লিটাজোন দিনে একবার। ভোগ্লিবোজ দিনে তিনবার। ওষুধ দিনে কতবার নিতে হবে তা নির্ভর করে ওষুধ গ্রহণের পর সেটি শরীরের কতক্ষণ থাকে তার উপর। এই ওষুধগুলির মিশ্রণ হলে হয় যে ওষুধ দিনে একবার খাওয়ার সেটি দুই বা তিনবার খাওয়া হবে। অথবা যে ওষুধ দিনে দু-তিনবার খাওয়ার কথা সেটি একবার খাওয়া হবে।

আবার দেখুন সালফোনিলইউরিয়া খেতে হয় খাওয়ার মিনিট পনেরো আগে, মেটফরমিন খাওয়ার সঙ্গে বা খাওয়ার পরে, ভোগ্লিবোস খাওয়ার সঙ্গে। ওষুধগুলিকে মেশানো হলে তেমনটা সম্ভব হবে কি?

ডায়াবেটিসের ওষুধ সঙ্গে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ বা উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ মেশানো স্পষ্টতই অবৈজ্ঞানিক।

বেনফোটিয়ামিন ভিটামিন বি$_১$, অর্থাৎ থায়ামিনের জ্ঞাতি। ডায়াবেটিসের জটিলতার মধ্যে অন্যতম হল ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি অর্থাৎ ডায়াবেটিস-জনিত নার্ভের বিকার। স্নায়ুর রক্ত চলাচলে ব্যাঘাতের কারণে এই বিকার ঘটে। তার চিকিৎসা করার জন্য ডায়াবেটিসের ওষুধে ভিটামিন বি$_১$ বা বি$_{১২}$ মেশানোর কোনো যৌক্তিকতাই নেই।

ক্রোমিয়াম যৌগ ডায়াবেটিসে নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুস্থ অবস্থায় ইনসুলিন দ্বারা গ্লুকোজের ব্যবহারে অল্প মাত্রায় ক্রোমিয়াম লাগে। কিন্তু শরীরে ক্রোমিয়ামের অভাব হয় না বললেই চলে। তাই মুখে খাবার ডায়াবেটিসের ওষুধে ক্রোমিয়াম মেশানো অযৌক্তিক।

ব্রোমোক্রিপ্টিন ডায়াবেটিসে ব্যবহার করা হয় বটে কিন্তু কীভাবে তা কাজ করে তা অজানা।

এই প্রতিবেদন পড়ার পর আশা করব—আপনার ডাক্তার যদি আপনাকে ডায়াবেটিসের মিশ্রণ ওষুধ দেন তাহলে তাঁকে প্রশ্ন করবেন, বলবেন একাধিক ওষুধের প্রয়োজন হলে ওষুধগুলিকে আলাদা আলাদা দিতে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী।

টুকরো খবর

জাপানি বিজ্ঞানী ইশিনোরি ওসুমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন

এই অক্টোবর মাসে জাপানি বিজ্ঞানী ইশিনোরি ওসুমি-র নাম চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২০১৬ সালের নোবেল প্রাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 'অটোফেজি' বা 'আত্মভক্ষণ' পদ্ধতির ওপর তাঁর গবেষণা। ১৯০৫ সালে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার চালু হবার পর থেকে এটা হল ১০৭-তম পুরস্কার। নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্য নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার ডলার।

চিত্র: ইশিনোরি ওসুমি

'অটোফেজি' বা 'আত্মভক্ষণ' হল যেকোনো কোষের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক অঙ্গ, আর মানুষের স্বাস্থ্য বা রোগে এর বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এই পদ্ধতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ নিজেকে শেষ করে, আর তার ভেতরকার দ্রব্যের পুনর্নবীকরণ ঘটায়। যথাযথ 'আত্মভক্ষণ'-এর অভাব কোষ ও জীবের জরা ও ক্ষয়ের কারণ।

১৯৬০-এর দশকে গবেষকরা দেখেন যে এক-একটি কোষ নিজের বিভিন্ন অংশকে 'লাইসোজোম' নামক একটা পাতলা পর্দার তৈরি ফাঁপা প্রত্যঙ্গের মধ্যে নিয়ে ধ্বংস ও পুনর্ব্যবহার করতে পারে। নোবেল পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, '১৯৯০-এর দশকে 'আত্মভক্ষণ' নিয়ে কাজ করা খুব শক্ত ছিল। বেকারিতে যে ইস্ট ব্যবহার হয় তাদের নিয়ে ইশিনোরি ওসুমি অসাধারণ কিছু পরীক্ষা একের পর এক করেছিলেন আর তার ফলে 'আত্মভক্ষণ' সংক্রান্ত জিনগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। এরপর ওসুমি ইস্ট কোষে আত্মভক্ষণের প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করে দেখান। মানুষের কোষেও একইরকম ও জটিল পদ্ধতিতে আত্মভক্ষণ হয় সেটাও তিনিই দেখিয়েছেন।

ওসুমি-র কাজের ফলেই কোষ তার নিজের ভেতরকার নানা জিনিস কেমন করে পুনর্ব্যবহার করে সে ব্যাপারে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে যায়।

পুরস্কারের ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, 'যে সব জিন আত্মভক্ষণ করানোর কাজে লাগে তাদের মিউটেশন হলে রোগ হয়, কেন না আত্মভক্ষণ ও তার ত্রুটি ক্যানসার ও পার্কিনসনিজম ইত্যাদি নানা স্নায়ুরোগের জন্য দায়ী।'

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ৩ অক্টোবর ২০১৬, Japan's Yoshinori Ohsumi wins Nobel Medicine Prize for work on cell 'recycling', ইন্টারনেটে। http://times of indiatimes.com/home/science/yoshinori-Ohsumiwins-Nobel-medicine-prize/articleshow/5465522 -এ লভ্য। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

টুকরো খবর

মানুষের আয়ুর শেষ সীমা কি ১১৫ বছর?

আমেরিকার নামকরা জার্নাল *নেচার*-এ আমেরিকান বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, মানুষের আয়ুর শেষ সীমা ১১৫ বছরের আশেপাশেই। অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য এই গবেষণাকে একেবারেই মেনে নেননি।

বিগত কয়েক দশকের মানুষের গড় আয়ু আর যেসব মানুষ খুব দীর্ঘায়ু, তাঁদের আয়ু, এ-দুটো খতিয়ে দেখে আমেরিকান এই বিজ্ঞানীরা এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁরা মানুষের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে যেসব আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, জাপানি ও ইংরেজ ১১০ বছরের বেশি বেঁচেছেন তাঁদের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যের সাহায্যে তাঁরা সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেছেন।

এই তথ্য দেখাচ্ছে যে গড় আয়ু, বা কোনো মানুষের কতদিন বাঁচার সম্ভাবনা, সেটা এই দীর্ঘজীবী শতায়ুদের ক্ষেত্রে আর বাড়ছে না—ব্যাপারটা গত দুই দশকে যেন একটা উচ্চতায় স্থির হয়ে গেছে। আগের চাইতে অনেক বেশি মানুষ বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচছেন, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আগের দিনের অল্প কিছু মানুষ খুব বেশিদিন বাঁচতেন—আজকের দিনের দীর্ঘায়ু মানুষরা তাঁদের চাইতে বেশিদিন বাঁচছেন না। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতে, এর চাইতে বেশি বাঁচবেন এমন মানুষের সংখ্যা ভবিষ্যতেও খুব কম হবে। একজন ১২৫ বছর বয়সিকে পেতে হয়তো—'আপনাকে একশোটা পৃথিবীর মতো গ্রহ ঘুরে আসতে হবে।'

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান তুলনায় বাড়া, ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি, যেমন টিকাকরণ, এর ফলে উনবিংশ শতক থেকে মানুষের গড় আয়ু ক্রমশ বেড়েছে। কিন্তু এটা কি চিরকাল ধরে বেড়েই চলতে পারে?

> ১০৫ বছর বা তার ওপরের বয়সিদের অংশ বাড়ছে না, আর তাঁদের আয়ুও আর বাড়ছে না। মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় মানুষের আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। ইতিহাসে এই প্রথম আমরা শেষ সীমাটা দেখতে পাচ্ছি, আর সেটা মোটামুটি ১১৫ বছর।

১৯৯৭ সালে যখন ফরাসি মহিলা জাঁ ক্যামেঁত মারা গেলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১২২ বছর, আর এর সপক্ষে প্রমাণও ছিল। তিনিই পৃথিবীতে সব থেকে বেশিদিন বেঁচেছিলেন। তারপর আর কেউই অতদিন বাঁচেননি, অন্তত সেরকম বেশি আয়ুর প্রমাণ নেই।

বয়স বাড়া আটকানো যায়?

বিবর্তন (ইভোলিউশন) আমাদের খুব বেশি বাঁচবার জন্য তৈরি করেনি, আর এটাই হল বয়স বাড়া আটকানোর মূল সমস্যা। প্রাকৃতিক নির্বাচন কয়েক লক্ষ বছর ধরে মনুষ্যপ্রজাতিকে যুবক অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে বেঁচে থাকার ও বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা দিয়েছে, সেখানে বৃদ্ধের কী দাম? মোটামুটি বছর পঞ্চাশ বয়স হলে আমাদের দেহে জরা শুরু হয়, সেটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক, কেননা মানুষ প্রজাতি যখন তৈরি হয়েছে তখন তারা কেউই পঞ্চাশ বছর বাঁচত না।

তাই মনে হয়, জীবনকাল একটা স্তরের পর বাড়াতে গেলে খালি অসুখের চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ, এমনকী সুস্থ জীবনযাপনের সব শর্ত মেনে চলাতেই হবে না। আমাদের প্রতি কোষে যে বয়ঃবৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে সেটা আটকানোর ব্যবস্থা দরকার। অন্যদিকে, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী নিয়ে গবেষণাগারের পরীক্ষায় আয়ুর একটা শেষ সীমা আছে, এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, ইঁদুর বেশি হলে ১০০০ দিন আর কুকুর ৫০০০ দিন বাঁচে।

প্রফেসর জ্যান ভিগ আমেরিকান গবেষকদলের অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, ১২০, ১২৫, এমনকী হয়তো ১৩০ বছর আয়ু পাওয়া সম্ভব, তবে কিনা 'তার জন্য খুব মৌলিক কিছু করা দরকার।'

এই আয়ু-সীমা টানার বিরুদ্ধে বলছেন অনেক বিজ্ঞানী

একজন নামকরা আয়ুবিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিন্ডা প্যাট্রিজ বলেছেন, 'আমাদের জীবনকালের একটা সীমা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এতাবৎ কী ঘটেছে, সেটা এই গবেষণা থেকে জানা গেল, কিন্তু তা থেকে ভবিষ্যতে ঠিক কী ঘটবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। . . . যে সব শতজীবীকে এই গবেষণায় নেওয়া হয়েছে, তাঁরা ছোটোবেলায় ছোঁয়াচে রোগ আর পুষ্টির অভাবে ভুগেছেন, কারণ তাঁদের ছোটোবেলায় এ দুটো ছিল খুব স্বাভাবিক—যেমন ১৯৮০ সালের আগে গুটিবসন্ত দূর হয়নি। এখন যারা জন্মাচ্ছে, তাদের জীবন অনেক অন্যরকম হবে। অবশ্য সেটা খারাপও হতে পারে, কারণ এখন বাচ্চা ও বয়স্করা এত মোটা হচ্ছে যে তাদের আয়ু কমে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।'

প্রোফেসর জেমস ভাউপেল জনভিত্তিক গবেষণার একজন বড়োমাপের গবেষক। তিনি কিন্তু এই গবেষণার পদ্ধতি ও ফলের সঙ্গে একেবারেই একমত নন। 'গবেষণার-ব্যঙ্গ কর্ম' বলেই তিনি এটাকে অভিহিত করেছেন; বলেছেন, এর আগে গবেষণা করে মানুষের জীবনসীমা ৬৫ বছর, ৮৫, বছর, ১০৫ বছর—এসব বলা হয়েছিল। সবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 'যাঁরা মনে করছেন আয়ুর এরকম একটা বাঁধাধরা সীমা আছে আর আমরা সেই সীমার কাছে এসে গেছি, তাঁরা জনভিত্তিক গবেষণা বা সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম কোনোটা দিয়েই তাঁদের কাজকে প্রমাণ করছেন না। তাঁদের যেটা মনোগত ধারণা, সেটাই তাঁরা মনভোলানো কথা, অকেজো পদ্ধতি আর ''সুন্দর সুন্দর গ্রাফ'' দিয়ে ''প্রমাণ'' করে ছাড়ছেন . . . আমরা কতদিন বাঁচব সে নিয়ে এই গবেষণা সত্যি সত্যি কিছুই বলতে পারে না।'

ভবিষ্যতের ঘটনা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়তো একদিন আরেকটু জোর দিয়ে বলতে পারবে, আমাদের আয়ুর সীমা সত্যিই ১১৫ বছরেব আশেপাশে কিনা। ততদিন জীবনকে সুস্থ রাখুন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি নিউজ, ৫ অক্টোবর ২০১৬, Limit to human life may be 115 (ish)। ইন্টারনেটে http://www.bbc.com/news/health-37552116 -তে লভ্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ক্ষুধাসূচকের তালিকায় ভারতের অবস্থান খারাপ

টাইমস নিউজ সার্ভিস ১২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জানিয়েছে, ক্ষুধাসূচক (Global Hunger Index) তালিকায় ভারতের স্থান ১১৮টি দেশের মধ্যে ৯৭-তম। এর মানে হল যে ভারতের চাইতে বেশি ক্ষুধায় কষ্ট পান মাত্র ২০টি দেশের মানুষ। রিপোর্টের জন্য মোট ১৩১টি দেশ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সব দেশ থেকে উপযুক্ত তথ্য না মেলায় ১১৮টি দেশের তালিকা তৈরি হয়েছে।

অন্যভাবে বললে, শূন্য (ক্ষুধা একেবারেই নেই) থেকে ১০০ ক্ষুধা সবথেকে বেশি) নম্বর দিয়ে যে মাপকাঠি আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি হয়েছে, তাতে ভারত পেয়েছে ২৮.৫। বিগত কয়েক দশকে ভারতের কিছু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তালিকাতে এদেশের স্থান খানিকটা নেমে এসেছে। সেটা হবার কারণ হল দুটো। এক, অন্য দেশগুলো তুলনায় আরও উন্নতি করেছে—যেমন বাংলাদেশ তালিকায় ভারতের নীচে ছিল, এখন তা ভারতের চাইতে অল্প ওপরে। দুই, পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুদের মৃত্যুহার এদেশে অনেকটা কমেছে বটে, কিন্তু ওই বয়সিদের মধ্যে বয়সের তুলনায় বেঁটে হয়ে যাওয়া শিশুর অনুপাত কমেনি।

আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (International Food Policy Research Institute, সংক্ষেপে IFPRI) ক্ষুধাসূচক মাপে, তাঁরা ভারতের অবস্থাকে সংকটজনক (serious) বলেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে চীন-এর অবস্থা খুব ভালো—এই তালিকায় চীন আছে ২০ তম স্থানে। ভারতের চেয়ে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, এমনকী নেপালও ভালো অবস্থায় আছে, কিন্তু পাকিস্তান (১০৭ তম স্থান) আর আফগানিস্তানের অবস্থা আমাদের থেকেও খারাপ। সবথেকে তলায় আছে চাদ, ইথিয়োপিয়া, সিয়েরা লিওন ইত্যাদি আফ্রিকার ভুবন-কুখ্যাত দরিদ্র দেশগুলো। কিন্তু আফ্রিকার এই দেশগুলো কোনোটাই ভারত-পাকিস্তানের মতো প্রতিরক্ষা খাতে এত টাকা ঢালে না, বা পরমাণু বোমা বানায় না।

ভারতের ক্ষুধার কারণগুলো কী

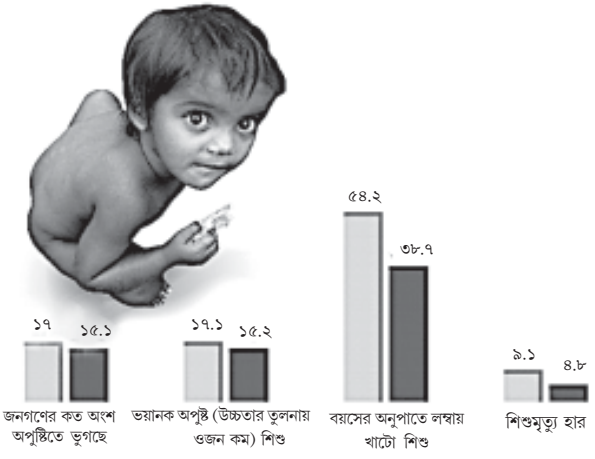

বিগত তালিকার সঙ্গে ২০১৬-তে ভারতের অবস্থার তুলনা

ক্ষুধাসূচক মাপার জন্য চারটে মূল তথ্য লাগে। এক, জনগণের কত অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে; দুই, ভয়ানক অপুষ্ট (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম) কত শতাংশ শিশু (৫ বছরের নীচে); তিন, বয়সের অনুপাতে লম্বায় খাটো হয়ে যাচ্ছে কত শতাংশ শিশু; চার, ওই বয়সের শিশুদের মৃত্যুহার। শিশুপুষ্টিকে পুষ্টিবিশারদরা খুব গুরুত্ব দেন, কেননা শিশুবয়সে এইরকম অপুষ্টি সারা জীবনের জন্য মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে কমজোরি করে দেয়।

আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট বলছে, ভারতের মোটামুটি ৩৯ শতাংশ শিশু বয়সের অনুপাতে লম্বায় খাটো, আর এটা দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির লক্ষণ। এই দেশ তালিকার শেষদিকে যাবার বড়ো কারণ হল এই বিপুল সংখ্যক দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা। ভারতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শিশুপুষ্টি প্রোগ্রাম (ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম, সংক্ষেপে আইসিডিএস) চলে, কিন্তু তাতেও ভারতে শিশু অপুষ্টি এত বেশি। ভারতের দারিদ্র, বেকারি, স্বাস্থ্যবিধি মানা সম্ভব না হওয়া ও নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব এই দেশের দুরবস্থার কারণ। শিশুপুষ্টি প্রোগ্রাম না থাকলে ভারতের অবস্থা আরও অনেক খারাপ হত। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়, মানুষের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া ক্ষুধা দূর করা যাবে না।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ইন্টারনেটে http://timesofindia.indiatimes.com/india/india-ranks-grim-97-of-118-countries-on-hunger-index/articleshow/54812143.cms-এ লভ্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ভারতের তিন বৃহৎ হত্যাকারী: হার্ট অ্যাটাক, ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের রোগ, স্ট্রোক

হার্ট অ্যাটাক, শ্বাসকষ্টের দীর্ঘমেয়াদি রোগ, আর মস্তিষ্কের স্ট্রোক হল ভারতে এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কারণ। এই তিনটে ছাড়া ডায়াবেটিস ও দীর্ঘমেয়াদি কিডনির অসুখ এদেশের সবথেকে বড়ো মারক দশটি রোগের তালিকায় আছে—এই পাঁচটি রোগ হল এই তালিকায় থাকা অসংক্রামক রোগ, আর বাকি পাঁচটি হল সংক্রামক রোগ।

প্রথম দশটি মারক রোগের তালিকায় বাকি রোগগুলো হল ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া (ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের সংক্রামক রোগ), ডায়রিয়া (যা তুলনায় সহজে ঠেকানো যায় ও সাধারণত সামান্য চিকিৎসাতেই সেরে যায়), টিবি বা যক্ষ্মা—এইগুলো হল সংক্রামক রোগ। এছাড়া 'মারক দশ'-এর তালিকাতে রয়েছে সদ্যোজাত ও সময়ের আগে জন্মে যাওয়া বাচ্চার রোগ ও পথ দুর্ঘটনা। এদেশের মোট মৃত্যুর শতকরা ৬০ ভাগ 'মারক দশ' রোগের কারণে ঘটে। ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রোগজীবাণুর কারণে, অর্থাৎ সংক্রামক রোগে মৃত্যু তুলনায় কমে আসছে, কিন্তু বয়স ও জীবনযাত্রাজনিত অসংক্রামক রোগে মৃত্যু সারা বিশ্বেই বাড়ছে। ভারতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মান্য জার্নাল *ল্যান্সেট* ২০১৫ সালে ১৯৫টি দেশের তথ্য নিয়ে করা এক রিপোর্টে (Global Burden of Diseases 2015) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ২৪৯টি মৃত্যুর কারণকে দেখা হয়েছে, এবং সমস্ত দেশের প্রবণতাকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। 'অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও সংক্রামক রোগগুলোকে আগের চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারার ফলে সেগুলোতে আগের মতো বেশি মানুষ মরছেন না, কিন্তু কম নড়াচড়া করে বসে বসে কাজ করা, আরও জীবনযাত্রার (পরিবর্তিত) ধরন, এমনকী বর্ধিত আয়ু—এদের মিলিত ফলে ভারতে অসংক্রামক বা বিপাকীয় রোগে মৃত্যু বাড়ছে।'

ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া এইসব চিকিৎসা করে সারানোর মতো রোগে মৃত্যু ও সময়ের আগে জন্মানো সদ্যোজাত শিশুমৃত্যু—এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান যথোচিত নয়, এবং নিরাপদ পানীয় জল ও শৌচাগার-পয়ঃপ্রণালীর মতো জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলিতেও আমরা পিছিয়ে। অন্যদিকে, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক— এগুলোর সংখ্যা বাড়ছে।

ভারতে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু দ্রুত বাড়ার উদাহরণ হল ডায়াবেটিস—২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সালে ডায়াবেটিসে মৃত্যু বেড়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ। এই একই সময়ে দীর্ঘমেয়াদি কিডনির রোগে মৃত্যু বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ, আর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বেড়েছে শতকরা ১৭ ভাগ। ২০০৫-২০১৫ সালে সময়ের আগে জন্মানো বাচ্চার মৃত্যুহার কিন্তু শতকরা

ভারতে মৃত্যুর দশটি প্রধান কারণ ও গত দশকে তার পরিবর্তন

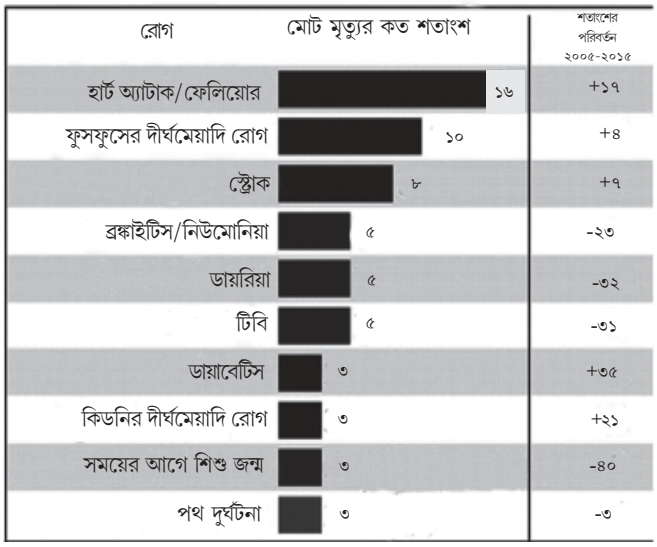

৪০ ভাগ কমেছে। আর এই দশ বছরে সব সংক্রামক রোগ মিলিয়ে মৃত্যুর হার কমেছে শতকরা ২০-৩০ ভাগ।

ল্যান্সেট-এর প্রবন্ধের মতে, দরিদ্র ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাহীন দেশগুলো একদিকে, আর উন্নত দেশগুলো একদিকে—এভাবে রাখলে ভারতের মাঝামাঝি অবস্থা পরিষ্কার হয়। বিশ্বের এক দরিদ্রতম দেশ আফ্রিকার নাইগার-এ মাথাপিছু উৎপাদন (per capita GDP) ভারতের এক-পঞ্চমাংশ। সেখানে দশটি প্রধান মারক রোগের ৮টি সংক্রামক রোগ। অন্যদিকে নরওয়ে, যার মাথাপিছু উৎপাদন ভারতের দশগুণ, সেখানে দশটি প্রধান মারক রোগের মাত্র একটি সংক্রামক রোগ।

চীনের অবস্থা ভারতের মতোই ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে মারক রোগের বিচারে সে দেশ উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হয়ে পড়েছে—দশটি প্রধান মারক রোগের একটিমাত্র সংক্রামক রোগ, ঠিক নরওয়েরই মতো। তবে চীন আর ভারত—এ দু-দেশেই পথ দুর্ঘটনার মৃত্যু বাড়ছে—বিশাল জনসংখ্যা আর দ্রুতগতির মোটরযানের অতিবৃদ্ধি দু-দেশেরই সমস্যা।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৯ অক্টোবর ২০১৬, Top 3 killers in India: Heart attack, lung ailments, stroke, ইন্টারনেটে http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/Top-3-killers-in-India-Heart-attack-lung-ailments-strfoke/articleshow/54932554.cms-এ লভ্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মাথা যন্ত্রণা কি হবেই?

ডা. সুমিত দাশ

মাথা আছে আর মাথার যন্ত্রণা নেই? কথার কথা বটে, কিছুটা সত্যিও। যত রোগী আসেন তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি হয় যে উপসর্গটি সেটা হচ্ছে 'মাথা যন্ত্রণা'। শতকরা চল্লিশ ভাগ রোগীর এই উপসর্গ থাকে।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমরা কলেজে পড়ার সময় এক বিশেষ ছাত্র সংগঠনে ছাত্র রাজনীতি করতাম। আমাদের এক প্রিয় নেতা এবং সিনিয়র দাদা আমাদের নিয়ে ঘরে সাংগঠনিক মিটিং করত। যখন বিতর্ক চরমে উঠত, চেঁচামেচি হইহল্লায় সভা প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত, সেই দাদা চেঁচিয়ে বলত—তোরা চুপ করবি, আমার 'মাইগ্রেন অ্যাটাক' হচ্ছে। আমরা চুপ করে যেতাম। 'মাইগ্রেন' নামে এই মাথাযন্ত্রণার এত সফল প্রয়োগ আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই।

মাথ্য ব্যথা কেন

মাথা ব্যথা কেন হয় এটা নিয়ে মানুষ সাধারণত দুটো মেরুতে ঘোরাফেরা করে। সবথেকে বেশি লোক ভাবে চোখের সমস্যা বা সাইনাসের সমস্যার জন্যে হয়। তাই অধিকাংশ মানুষ চোখ দেখিয়ে এবং সাইনাসের এক্স-রে নিয়ে আসে। আর এক দল ভাবে ব্রেন টিউমার হয়ে গেছে—তাই তারা সিটি স্ক্যান করে নিয়ে আসে।

'রিফ্র্যাকশন'-এর সমস্যা বা সাধারণ ভাষায় চোখে 'পাওয়ার' এলে মাথা যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু তার একটা প্রকৃতি আছে। অনেকক্ষণ ধরে চোখের কাজ করলে এবং/বা কম আলোতে কাজ করলে চোখের চারপাশে যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু চোখের কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন হঠাৎ করে মাঝে মাঝে মাথা যন্ত্রণা কোনোভাবেই চোখের সমস্যার জন্যে নয়।

'সাইনুসাইটিস' বা সাইনাসের প্রদাহ হলে তাকে সাধারণ মানুষ 'সাইনাস' বলে—এতে করে মুখ এবং কপালের সেই সাইনাস (বা হাড়ের মধ্যে ফাঁকা স্থানে)-এর উপর চাপ দিলে ব্যথা লাগে। এছাড়া নাক দিয়ে সর্দি গড়ানো, নাক আটকে যাওয়া এগুলো থাকবে। সাইনাসের এই সব উপসর্গ না থেকে মাথা ব্যথা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেটা মাইগ্রেন।

এবার আসা যাক 'ব্রেন টিউমার' প্রসঙ্গে। একটু বেশি উদ্বিগ্ন রোগী মাথা ব্যথা মানেই ধরে নেয় ব্রেন টিউমার হয়েছে। তাই ডাক্তারকে চাপ দেন সিটি স্ক্যান করার জন্যে। কিন্তু ২০০০ জনে মাত্র ১ জনের সম্ভাবনা থাকে মস্তিষ্কে টিউমার বা অন্য কোনো 'ক্ষত' থাকার। যে রোগী যত বেশি দিন মাথা যন্ত্রণায় ভুগছে সে তত চায় একটা স্ক্যান করতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ব্রেন টিউমার থাকার সম্ভাবনা এদেরই সবথেকে কম—কারণ তাহলে এত দীর্ঘদিন ধরে অন্য কোনো উপসর্গ ছাড়া সে বেঁচে থাকত না।

তবুও ব্রেন টিউমার একটা ভয়ংকর রোগ তাই এটা হলে কী ধরনের উপসর্গ আসতে পারে দেখে নেওয়া যাক—

১. মাঝবয়সি মানুষের যদি হঠাৎ কিছুদিন হল মাথাযন্ত্রণা শুরু হয়। ২. আগের মাথা যন্ত্রণার ধরন যদি পালটায়—অর্থাৎ তীব্রতা এবং সংখ্যা যদি বাড়ে। মাথা যন্ত্রণার সঙ্গে যদি নতুন কোনো উপসর্গ আসে। ৩. মাথা যন্ত্রণার দু-টি আক্রমণের মাঝে যদি অন্য উপসর্গ আসে। ৪. স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষা করে অন্য অস্বাভাবিকত্ব পাওয়া গেলে। এই সব ক্ষেত্রে ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

> যত রোগী আসেন তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি হয় যে উপসর্গটি সেটা হচ্ছে 'মাথা যন্ত্রণা'

মাথা যন্ত্রণা কত রকমের

১. মাইগ্রেন

মাইগ্রেন হচ্ছে সেই মাথাযন্ত্রণা যাকে অনেকেই 'আধকপালে' বলে জানে। এর কারণ অনেকক্ষেত্রেই যন্ত্রণাটা কপালসহ মাথার একটা দিকে হয়। যন্ত্রণাটা শুরু হয় সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে। ৪০ বছর বয়সের পর মাইগ্রেনের প্রথম আক্রমণ হচ্ছে এটা প্রায় বিরল। নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়, তবে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

যন্ত্রণা মাথার একদিক দিয়ে শুরু হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু-দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণার ধরনটা হয় দপদপে। সঙ্গে অনেকের বমিভাব থাকে।

অনেকক্ষেত্রেই চোখ দিয়ে জল পড়ে বা চোখ লাল হয়ে যায়। আলো সহ্য হয় না, অন্ধকার ঘরে থাকতে ভালো লাগে। কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রণা মাথার পেছন দিকে আরম্ভ হয়ে ঘাড়ের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে মাথার পেছন থেকে মাথার পাশ দিয়ে যন্ত্রণা এসে চোখের পেছনে হতে থাকে। মাইগ্রেনে অনেকে বলেন যেন চোখের মধ্যে দিয়ে গরম ছুরি চালানো হচ্ছে। কারোর মনে হয় ছুঁচ ফোটানো হচ্ছে। অনেক সময় মাথায় সামান্য স্পর্শেও খুব জোরালো ব্যথা লাগে। যন্ত্রণা একবার শুরু হলে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

এগুলো হল মাইগ্রেন যন্ত্রণার রূপ। কিন্তু যন্ত্রণা শুরুর আগেও কিছু কিছু উপসর্গ আসতে পারে। অনেকের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কারোর কারোর মনে একদিনের জন্যে খুব ফুর্তি আসে। সে খুব কাজ করতে থাকে। তারপর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। তখন সে ভাবে বেশি কাজ করার জন্যে মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু আসলে কাজ না করলেও এই যন্ত্রণা হত। কেউ কেউ যন্ত্রণা শুরুর আগে চোখে ঝাপসা দেখে।

২. টেনশান হেডেক

এই নামকরণের অর্থ এই নয় যে 'টেনশন' বা মানসিক চাপের জন্য মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। বলা হয় মাথার পেশিগুলোতে সংকোচন হচ্ছে বলে মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। সাধারণত মাথার পেছন থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে মাথার উপরে উঠে কপালের দিকে চলে আসে। অথবা কপাল দিয়ে সারা মাথা গোল করে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার ধরনটা হয় 'চাপ' দেওয়া বা একটা দড়িকে 'টাইট' করে মাথায় বেঁধে দিলে যেরকম লাগবে, সেরকম। হঠাৎ এই যন্ত্রণা শুরু হলে তাকে অ্যাকিউট টেনশন হেডেক বলে। কিছু ক্ষেত্রে মাথা ঘোরে, মনোযোগের অভাব হয়। অনেকক্ষেত্রে অবসাদ বা উদ্বেগের উপসর্গ হয়। অ্যাকিউট টেনশন হেডেক আর মাইগ্রেনের পার্থক্য করতে গেলে দেখতে হবে চোখের পেছনে তীব্র যন্ত্রণাটা হচ্ছে কিনা যেটা মাইগ্রেনে হয়। অনেকক্ষেত্রে দু-ধরনের যন্ত্রণার মিশ্র উপসর্গ আসে। টেনশন হেডেক যদি প্রায় রোজ হয়, তাকে ক্রনিক টেনশন হেডেক বলে।

> মাইগ্রেন যন্ত্রণা শুরুর আগেও কিছু কিছু উপসর্গ আসতে পারে। যেমন—মেজাজ খিটখিটে, কারো-কারো মনে একদিনের জন্যে ফুর্তি ফলে সে খুব কাজ করতে থাকে। তারপর শুরু হয় মাথা যন্ত্রণা। তখন সে ভাবে বেশি কাজ করার জন্যে যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু আসলে কাজ না করলেও এই যন্ত্রণা হত।

৩. ক্লাস্টার হেডেক

এটা এক বিশেষ ধরনের মাথা যন্ত্রণা। যেটাকে এক ধরনের মাইগ্রেনও বলা যায়। একবার শুরু হলে পরপর কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত এই আক্রমণ বারবার চলতে থাকে। দু-টি আক্রমণের মাঝে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। এই রকম 'একগোছা' মাথা যন্ত্রণা পরপর হয় বলে একে 'ক্লাস্টার হেডেক' বলা হয়।

সাধারণত পুরুষ মানুষদের এই যন্ত্রণা বেশি হয়। যন্ত্রণাটি রাতে বেশি হয়। হঠাৎ করে শুরু হয়। পিন ফোটানো বা চিনচিনে যন্ত্রণা চোখের পেছনে বা নাকে হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণার তীব্রতা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মানুষটির মনে হয় যেন একটা গরম লোহার শিক তার নাক চোখে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা যেন অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত চোখটি জবাফুলের মতো লাল হয়ে যায়। জল পড়ে চোখ দিয়ে। নাক আটকে যায়, নাক দিয়ে জল পড়ে। সাধারণত এক একটা আক্রমণ আধঘণ্টা থেকে দু-ঘণ্টা থাকে।

মদ খেলে আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। এক একটা আক্রমণের পরে চোখ এবং চিবুকে ব্যথা থাকে। যেদিকে আক্রমণ হয় সেদিকের চোখের পাতা কিছুটা বুজে যেতে পারে এবং চোখের তারা বড়ো হয়ে যায়।

৪. পোস্ট ট্রমাটিক হেডেক

মাথার চোট হলে, বিশেষ করে মস্তিষ্কে চোট লেগে রক্তক্ষরণ হলে যে যন্ত্রণা হয় তাকে বলা হয় পোস্ট ট্রমাটিক হেডেক। সাধারণত যে দিকে চোট হয় সেদিকেই যন্ত্রণা হয়। চেপে ধরা অনুভূতি হয়। এর সঙ্গে মাথা ভোঁ-ভোঁ করা, বিরক্তি বা মনোযোগের অভাব হতে পারে।

এই কয়েকটি ছাড়াও আরও কয়েক রকমের মাথা যন্ত্রণা হয়। ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে সেগুলো আলোচনা করা হল না।

চিকিৎসা

ক্লাস্টার হেডেকের জন্যে লিথিয়াম এবং মেথিসারজাইড, বাকি সব যন্ত্রণার মূল ওষুধ অ্যামিট্রিপটিলিন। মাথা যন্ত্রণার সঙ্গে অবসাদ বা উদ্বেগ রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

আর একটি কথা বলে আপাতত মাথা যন্ত্রণার ইতি টানা। অনেকে বলেন অম্বল হলে 'গ্যাস' মাথায় উঠে মাথা যন্ত্রণা হয়। কিন্তু পাকস্থলী থেকে 'গ্যাস' মস্তিষ্কে যাওয়ার কোনো নলপথ নেই। তাই এটা একটা ভুল ধারণা। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সুমিত দাশ এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

চিনি, হৃদ্‌রোগ ও গবেষণার ওপর বৃহৎ শিল্পের প্রভাব

চিনি খাওয়া ও হৃদ্‌রোগের সম্পর্ক কমিয়ে দেখানো আর স্যাচুরেটেড চর্বিকে হৃদ্‌রোগের কারণ বলে দেখানো—এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার বৃহৎ পুঁজির চিনিশিল্প গত শতকের ছয়ের দশকে বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করতে বিস্তর টাকা খরচ করেছে বলে জানা যাচ্ছে।

চিকিৎসাবিদ্যার মান্য পত্রিকা *জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন*-এর ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ (সংক্ষেপে JAMA Internal Medicine) ২০১৬-র সেপ্টেম্বর মাসে এ বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যার মূল ভিত্তি হল আমেরিকার চিনিশিল্পের নিজস্ব সংগঠনের ভেতরকার নানা নথি। এই গবেষণাপত্রের মূল বক্তব্য আমরা এখানে রাখছি—সম্পাদক, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*।

প্রাককথন

হৃদ্‌রোগ কথাটা দিয়ে আমরা সবাই যে একই জিনিস বুঝি, তা নয়। হৃদ্‌রোগের যে ধরনটা আমাদের খুব পরিচিত তা হল হৃদ্‌ধমনির রোগ, যা সাধারণত একটু বয়স্ক মানুষের হয়, বুকে ব্যথা হয় ও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এই পরিচিত ধরনের হৃদ্‌রোগ, বা হৃদ্‌ধমনির রোগ, আর তার সঙ্গে চিনি (কেমিস্ট্রির ভাষায় সুক্রোজ) খাবার সম্পর্ক ১৯৫০-এর দশকে বিজ্ঞানীদের নজরে আসে। কিন্তু তারপর চিনির সঙ্গে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্পর্ক নিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীমহল কেমন নীরব হয়ে যান। ডাক্তাররা হৃদ্‌ধমনির রোগের প্রতিকারে কেবল চর্বি খাওয়া কমানোর কথাই বলতে থাকেন, কেননা তাঁদের বইপত্রে সেটাই কেবল লেখা থাকত।

কিন্তু সত্যিই কি চিনি হৃদ্‌ধমনির রোগের জন্য দায়ী নয়? কেবল চর্বি কমিয়ে, বা বিশেষ ধরনের চর্বি এড়িয়ে খাদ্য বাছলেই কি হৃদ্‌ধমনির রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা বাড়বে? পরবর্তীকালে এ প্রশ্নের নতুন করে উত্তর খোঁজা হয়েছে, আর দেখা গেছে, চিনি খাওয়া কিছু কম বিপজ্জনক নয়। কিন্তু সেটা এখনও এদেশের সাধারণ মানুষ জানেন না, এমনকী ডাক্তাররাও সেভাবে চিনি বা চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দেন না। এর কারণ বুঝতে গেলে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানতে হবে, যা প্রায় কোনো গোয়েন্দা গল্পের মতোই রহস্যভেদের কাহিনি।

জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন-এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে হৃদ্‌ধমনির রোগের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক নিয়ে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর নিজস্ব নথি, নানা ঐতিহাসিক নথি ও বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রথম টাকা ঢালে ১৯৬৫ সালের এক গবেষণা প্রকল্পে। সেই গবেষণা প্রকল্পের ফল হল *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন* (আমেরিকার আর একটি মান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের জার্নাল)-এ প্রকাশিত পর্যালোচনা (রিভিউ), যা চর্বি আর কোলেস্টেরলকে হৃদ্‌ধমনির রোগের জন্য দায়ী খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত করে, আর চিনি বা সুক্রোজের ভূমিকাকে কমিয়ে দেখায়।

'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' ওই পর্যালোচনা বা 'রিভিউ' নিবন্ধটির উদ্দেশ্য ও কোন কোন মৌলিক গবেষণা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে সে সব ঠিক করে দিয়েছিল, তারপরে পর্যালোচনাটির খসড়া দেখে অনুমোদন করেছিল। অথচ কোথাও 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর এই অনুদান ও হস্তক্ষেপের কথা প্রকাশ করা হয়নি। চিনিশিল্পের নিজস্ব নথি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তারপর, ১৯৬০-১৯৭০ দুই দশকে অনেক গবেষণায় 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' একইরকম অনুদান ও হস্তক্ষেপ করেছে, আর সেইসব গবেষণাপত্র চিনির বিপদ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে আর চর্বিকে হৃদ্‌ধমনি রোগের কারণ বলে প্রতিপন্ন করেছে।

এখন আমেরিকাসহ সব দেশের নীতিনির্ধারকদের উচিত ইন্ডাস্ট্রি-অনুদানের ওপর নির্ভরশীল নানা গবেষণাকে কম গুরুত্ব দিয়ে রোগের পেছনে নানা শিল্পজাত দ্রব্যের ভূমিকা নিয়ে সত্যিকারের স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো।

ভূমিকা

১৯৫০-এর দশকে আমেরিকায় হৃদ্‌ধমনির রোগে মৃত্যু খুব বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যের নানা উপাদানের সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার হিড়িক পরে যায়। বিশেষ করে কোলেস্টেরল, ফাইটোস্টেরল (উদ্ভিদ থেকে পাওয়া

কোলেস্টেরলের অনুরূপ পদার্থ), খাদ্যে অতিরিক্ত ক্যালোরি, নানা অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রোটিনের উপাদান), ফ্যাট, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য—এদের সঙ্গে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্পর্ক খোঁজা শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকে দু-জন বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী এই রোগের কারণ হিসেবে দুটো আলাদা মতবাদের জন্ম দেন। জন ইয়ুডকিন (John Yudkin) বলেন, খাদ্যে যে চিনি মেশানো হয় সেটাই আসল অপরাধী। অন্যদিকে অ্যানসেল কীজ (Ancel Keys) বলেন, খাদ্যে চর্বির সামগ্রিক পরিমাণ, ও তার মধ্যে বিশেষ করে স্যাচুরেটেড চর্বি ও কোলেস্টেরল হল অপরাধী। স্যাচুরেটেড চর্বি বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা বিস্তৃতভাবে বলার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু মোটের ওপর এটা হল চর্বির একটা বিশেষ ধরন যা ক্ষতিকর বলে স্বীকৃত।

কিন্তু ১৯৮০-তে এসে দেখা গেল, খাদ্যে অতিরিক্ত চিনি মেশালে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্ভাবনা তেমন বাড়ে, এটা অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন না। তাই ১৯৮০ সালে প্রকাশিত প্রথম আমেরিকার ডায়েটারি

১৯৮০-তে এসে দেখা গেল, খাদ্যে অতিরিক্ত চিনি মেশালে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্ভাবনা তেমন বাড়ে, এটা অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন না।

গাইডলাইন হৃদ্‌ধমনির রোগ আটকানোর জন্য খাদ্যে মোট চর্বি, স্যাচুরেটেড চর্বি আর কোলেস্টেরল কমানোর ওপর জোর দেয়, চিনি খাওয়া নিয়ে বিশেষ কিছু বলে না। (US Department of Health and Human Services and Department of Agriculture. *Nutrition and Your Health Dietary Guidelines for Americans.* Washington, DC: US Government Printing Office; 1980) আমাদের দেশেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীমহল এ ব্যাপারে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মুখাপেক্ষী ছিলেন, তাই এদেশেও ডাক্তারবাবুরা ওই কথাটাই শিখলেন, ও রোগীদের খাদ্য নিয়ে তদনুযায়ী উপদেশ দিলেন। কিন্তু আমেরিকায় চিনিকে এমন অক্ষতিকর মনে করা হল কেন? সেটাই আজকের লেখাটির মূল উপজীব্য বিষয়।

আমেরিকার চিনিশিল্পের মালিকদের সংগঠন হল ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক 'সুগার অ্যাসোসিয়েশন'। খাদ্যে মেশানো চিনির কারণে হৃদ্‌ধমনির রোগ বাড়ছে, এটা 'সুগার অ্যাসোসিয়েশন' একেবারে অস্বীকার করেছেন। হৃদ্‌ধমনির রোগ হবার সম্ভাবনা চিনি খাবার জন্য ঠিক কতটা বাড়ে তাই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। সেই বিতর্ক বৈজ্ঞানিক বিতর্কই হওয়া উচিত। কিন্তু চিনিশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর নিজস্ব চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঠিক কীভাবে চিনিশিল্পের মালিকগোষ্ঠী ১৯৫০-১৯৬০ এই দুই দশকে হৃদ্‌ধমনির রোগের খাদ্যাভ্যাসজনিত কারণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।

নথিভিত্তিক অনুসন্ধান

১৯৪৩ সালে তৈরি 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' থেকে পরে 'সুগার অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ সময়পর্বে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন ছিলেন প্রফেসর রজার অ্যাডামস; তাঁর সঙ্গে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর চিঠিপত্র ও নথি চালাচালি (মোট ১৫৫১ পৃষ্ঠা) খুঁজে পাওয়া গেছে। এছাড়া ডি মার্ক হেগস্টেড ছিলেন হাভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ্-এর পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে প্রফেসর ও 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর প্রথম হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে গবেষণাপ্রকল্প (১৯৬৫-১৯৬৬)-এর সহ-অধিকর্তা; তাঁর সঙ্গে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর চিঠিপত্র ও নথি চালাচালি পাওয়া গেছে। এর বাইরে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর বিভিন্ন বার্ষিক রিপোর্ট, গবেষণা-সভা বিবরণী ও গবেষণা নিয়ে সংগঠনের ভেতরকার রিপোর্ট—এগুলোও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক ধরে খাদ্যের সঙ্গে ও হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে বিতর্ক চলেছিল তার নানা ঐতিহাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল আমেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস—ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল', আমেরিকার পাবলিক হেলথ্ কাউন্সিল, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন। *জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*-এর আলোচ্য গবেষণাপত্রটি প্রকাশকাল অনুসারে এই সমস্ত নথি সাজিয়ে দিয়েছে, যাতে সবাই যে যার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

হৃদ্‌ধমনির রোগ প্রতিরোধে কম চর্বিযুক্ত খাবার সুপারিশ করায় 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর স্বার্থ ছিল কি?

১৯৫৪ সালে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর প্রথম সভাপতি হেনরি হ্যাস 'চিনি নিয়ে গবেষণায় নতুন দিক কী?' এই শিরোনামে 'আমেরিকান সোসাইটি অফ সুগার বীট টেকনোলজিস্টস'-এর সভায় একটি বক্তৃতা দেন। সেখানে চিনিশিল্পের একটা নতুন নীতিগত সুযোগের কথা তিনি বলেন—যদি আমেরিকানদের কম চর্বি খেতে বাধ্য করা যায় তো তারা বেশি চিনি খাবে।

'অগ্রণী বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমেরিকার বেশি চর্বি খাবার অভ্যাসের সঙ্গে রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে ধমনি ও রক্তকজালক বন্ধ করার মতো প্লাগ তৈরি হবার, ও তার ফলে . . . হৃদ্‌ধমনির রোগ . . . যদি মাঝবয়সি আমেরিকানদের কম চর্বি খাওয়ানো যায়, তাহলে মাত্র ৫ দিনে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নেমে ঠিক জায়গায় চলে আসবে . . .

চিনিশিল্পের একটা নতুন নীতিগত সুযোগের কথা তিনি বলেন—যদি আমেরিকানদের কম চর্বি খেতে বাধ্য করা যায় তো তারা বেশি চিনি খাবে।

যদি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য আমেরিকান ডায়েটের শতকরা ২০ ভাগ ক্যালোরি পূরণ করতে পারে (চর্বি শতকরা ৪০ ভাগ ক্যালোরি জোগায়, কিন্তু শতকরা ২০ ভাগ মাত্র ক্যালোরি চর্বি থেকে আসা উচিত) আর যদি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য-বাজারের যে অংশটা 'চিনি' থেকে আসে, সেটাও ধরে রাখা যায় তাহলে মাথাপিছু চিনি খাওয়া এক-তৃতীয়াংশ বাড়বে, আর তার সঙ্গে মানুষে স্বাস্থ্যেরও বিশাল উন্নতি হবে।'

'যেসব মানুষ বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে পুরো অজ্ঞ তাদের . . . চিনিই যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আর আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার জন্য শক্তি জোগায়।'

এই কথাটা শেখানোর জন্য তারপর আমেরিকার চিনিশিল্প তখনকার বাজারে ছ-লাখ ডলার, যার বর্তমান মূল্য ৫৩ লাখ ডলার, খরচ করবে।

প্রসঙ্গত, 'যদি মাঝবয়সি আমেরিকানদের কম চর্বি খাওয়ানো যায়, তাহলে মাত্র ৫ দিনে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নেমে ঠিক জায়গায় চলে আসবে'—এটি একটি অবৈজ্ঞানিক কল্পকথা।

চিনি যে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায় সেই প্রমাণ ক্রমশ বাড়ছিল

১৯৬২ সালে দেখা যায় যে চর্বি কম খেলেও খাদ্যে চিনি বেশি থাকলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে। তখন 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' ও তার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টামণ্ডলী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর অধীনস্থ 'কাউন্সিল অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন'-এর রিপোর্ট *'খাদ্যে চর্বির নিয়ন্ত্রণ'* তাদের মাথাব্যথা বাড়ায়।

কী লেখা ছিল ওই রিপোর্টে? 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' ওই রিপোর্টের এই ব্যাখ্যা করে—'কম চর্বি খেলে কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট খাওয়া হচ্ছে সেটা কোলেস্টেরল তৈরির হার প্রভাবিত করে।' অর্থাৎ, চিনি খেলে কোলেস্টেরল তৈরির হার বেশি বাড়ে, এমন সম্ভাবনার কথাই ভাবা হচ্ছিল ওই রিপোর্টে। বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টামণ্ডলী সিদ্ধান্ত নেয়, [হৃদ্‌ধমনির রোগ বিষয়ে] গবেষণা খতিয়ে দেখতে হবে।' 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ সভাপতি জন হিকসন ছিলেন গবেষণা-অধিকর্তাও। তিনি বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন।

১৯৬৪-র ডিসেম্বরে হিকসন 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর উপসমিতিকে জানান যে হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে অধুনাতম গবেষণা উদ্বেগজনক। 'কম বা বেশি খ্যাতিসম্পন্ন নানা গবেষণাগার থেকে এমন রিপোর্ট আসছে যে চিনি অন্য সব শর্করাজাতীয় খাদ্যের চাইতে শক্তির

চিনি খেলে কোলেস্টেরল তৈরির হার বেশি বাড়ে, এমন সম্ভাবনার কথাই ভাবা হচ্ছিল

উৎস হিসেবে খারাপ—উদাহরণ হল ইয়ুডকিন-এর গবেষণা।' যে সব জনভিত্তিক সমীক্ষা হৃদ্‌ধমনির রোগের প্রাথমিক খাদ্যজনিত কারণ হিসেবে স্যাচুরেটেড চর্বির কথা বলছিল, ১৯৫৭ সাল থেকে ব্রিটিশ শারীরবিজ্ঞানী জন ইয়ুডকিন সে সব সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেন, ও বলেন যে অন্যান্য কারণ, যেমন চিনি, এই রোগের জন্য অন্তত পক্ষে সমান দায়ী।

হিকসন প্রস্তাব দেন, 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর একটা বড়োমাপের প্রোগ্রাম নেওয়া দরকার যাতে ইয়ুডকিন বা অনুরূপ যারা 'চিনির ব্যাপারে নেতিমূলক অবস্থান নিচ্ছেন,', তাঁদের পালটা বক্তব্য তৈরি করা যায়। হিকসন বলেন, একটা জনসমীক্ষা করা হোক যে 'কোন জনমত আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করব, আর কোন ধারণাগুলোকেই বা আমরা আমাদের গবেষণা ও তথ্য দিয়ে, বা আইনি কায়দায়, আটকানোর চেষ্টা করব।' হিকসন বলেন, একটি আলোচনাসভা করে 'চিনির বিরুদ্ধপক্ষীয়দের বিজ্ঞানী সহকর্মীদের সামনে এনে তাঁদের যুক্তির ভুলগুলো দেখিয়ে দিতে হবে।' তিনি 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর পয়সায় হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে গবেষণা চালানোর পক্ষে সওয়াল করেন—'[ধমনির অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস] শর্করাজাতীয় খাদ্যের জন্য হয় নাকি অন্য পুষ্টিপদার্থের কম বেশির জন্য হয়, সেটা প্রশ্নাতীত নয়। আমাদের সব প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সম্ভবত পুষ্টিবিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে, আর ওই রকম সমীক্ষাগুলো যথাযথ সংশোধন করে পুনরায় সেরকম গবেষণা করতে হবে। সেগুলোর ফল প্রকাশ করে তার সাহায্যে আমাদের বিরোধীপক্ষের ভুল দেখিয়ে দিতে হবে।' উল্লেখ্য, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হল ধমনি সরু হয়ে যাবার রোগ, ও এটাই হৃদ্‌ধমনির রোগের মূল।

ফ্রেডরিক স্টেয়ার ছিলেন হাভার্ড ইউনিভর্সিটির স্কুল অফ পাবলিক হেলথ্-এর পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। ১৯৬৫ সালে 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' স্টেয়ারকে তাদের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টামণ্ডলীতে অ্যাড হক সদস্য হতে আহ্বান জানায়। *স্টেয়ার হৃদ্‌ধমনির রোগের পুষ্টিজনিত কারণ* বিষয়ে নামজাদা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ও আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্স, ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউট, ও আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এ-ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিত। অন্যদিকে নানা বড়ো খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও খাদ্য ব্যবসায়ীদলও তাঁর পরামর্শ শুনত। অবশ্য ১৯৭০ সালের আগে অবধি স্টেয়ারের ব্যবসায়ীমহলের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও আর্থিক বন্ধনের কথা তেমন প্রশ্নের মুখে পড়েনি।

চিনি ও রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড বৃদ্ধির সম্পর্ক

১৯৬৫-র জুন মাসে জন হিকসন পূর্বোক্ত ডি মার্ক হেগস্টেডের সঙ্গে দেখা করেন। হেগস্টেড তখন হাভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে প্রফেসর, ফ্রেডরিক স্টেয়ার ছিলেন তাঁরই বিভাগীয় প্রধান। হেগস্টেড সেই জুন মাসেই *অ্যানালস অফ ইন্টারন্যাল মেডিসিন* নামক জার্নালে চিনির সঙ্গে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। প্রথম দু-টি গবেষণাপত্রে তিনি জনভিত্তিক (epidemiological) সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে রক্তে চিনির মাত্রার সঙ্গে ধমনির রোগ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি সম্পর্কযুক্ত ও কোলেস্টেরলের মাত্রার সঙ্গে বা রক্তচাপের সঙ্গে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সম্পর্ক তুলনায় কম। তৃতীয় গবেষণাপত্রটিতে হেগস্টেড দেখিয়েছেন যে শ্বেতসারের তুলনায় চিনি রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেশি বাড়ায়, এবং বলেছেন 'চিনির মধ্যে থাকে ফ্রুকটোজ, যা অন্য শর্করাজাতীয় খাদ্যে থাকে না—সেই ফ্রুকটোজ এর কারণ হতে পারে।' জার্নালটির ওই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়ও বলেছে, হেগস্টেডের গবেষণার ফল ইয়ুডকিন-এর বক্তব্যকে সমর্থন করে—যদি ট্রাইগ্লিসারাইডের উচ্চ মাত্রা হৃদ্‌ধমনির রোগের কারণ হয়, তাহলে 'চিনি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস সৃষ্টিকারী।'

১১ জুলাই *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন* একটা পুরো পৃষ্ঠা খরচ করে *অ্যানালস অফ ইন্টারন্যাল মেডিসিন* জার্নালে হেগস্টেডের গবেষণাপত্রটি নিয়ে আলোচনা করে। সেখানে বলা হয়, চিনি ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সম্পর্ককে এতদিন স্রেফ একটা তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবেই দেখা হচ্ছিল, আর অল্প কিছু সমীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু নতুন এইসব গবেষণার ফলে চিনি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায় এটা ভাবতেই হচ্ছে। *হেরাল্ড ট্রিবিউন* সিদ্ধান্তে আসে যে নতুন এইসব গবেষণার ফল 'খাদ্য ও হৃদ্‌ধমনির রোগের বিষয়টাকে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে।'

তখনও পর্যন্ত হেগস্টেডের প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চিনি শিল্পের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল, আর এটা মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে চিনিশিল্প এটাকে ভয় পাচ্ছিল। চিনি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের কারণ হতে পারে, আর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হৃদ্‌ধমনির রোগের কারণ, এটাই ছিল হেগস্টেডের গবেষণার মূল সুর। অন্যদিকে চর্বির ক্ষতিকর ভূমিকা নিয়ে তাঁর গবেষণায় কিছু বলা হয়নি। আমরা একটু পরে দেখব, 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে কেমন হঠাৎ করে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বক্তব্য' উলটো খাতে বইতে শুরু করে।

প্রোজেক্ট ২২৬—সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর পয়সায় গবেষণা পর্যালোচনা

১৯৬৫ সালের ১৩ জুলাই, অর্থাৎ *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন*-এর নিবন্ধটি ছাপা হবার দু-দিন পরে, 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর কার্যনির্বাহী সমিতি প্রোজেক্ট ২২৬-এর অনুমোদন দেয়। প্রোজেক্ট ২২৬-এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল শর্করাজাতীয় খাদ্য ও কোলেস্টেরলের বিপাক ও শরীরে তার প্রভাব নিয়ে প্রকাশিত সমস্ত গবেষণার পর্যালোচনা (literature review) করে একটা 'বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে' আসা। ফ্রেডরিক স্টেয়ার-এর তত্ত্বাবধানে

> 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে কেমন হঠাৎ করে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বক্তব্য' উলটো খাতে বইতে শুরু করে।

হেগস্টেড ও রবার্ট ম্যাকগ্যান্ডি এই কাজের ভার নেন। 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' এজন্য শুরুতে হেগস্টেডের হাতে ৫০০ ডলার বরাদ্দ করে (আজকের মূল্যমানে প্রায় ৩৮০০ ডলার), ও ম্যাকগ্যান্ডির গবেষণার জন্য দেয় ১০০০ ডলার। হেগস্টেডকে হিকসন চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এর অর্ধেক দেওয়া হবে যখন আপনারা এই প্রোজেক্টে কাজ শুরু করবেন, আর বাকিটা দেওয়া হবে যখন আপনারা জানাবেন যে গবেষণাপত্র [জার্নালে] প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছে।' শেষ পর্যন্ত 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' এঁদের মোট ৬৫০০ ডলার (আজকের মূল্যমানে প্রায় ৪৮,৯০০ ডলার) দিয়েছিল, আর এঁরা একটা 'গবেষণা পর্যালোচনা নিবন্ধ' (review article) প্রকাশ করেন। সেই নিবন্ধে চিনি, বিশেষ করে ফ্রুক্টোজ-এর বিপদের কথা আলোচিত হয়েছে এমন অনেক গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা করা হয়। প্রসঙ্গত, ফ্রুক্টোজ চিনির অংশ, কিন্তু অন্যান্য শর্করাজাতীয় খাদ্য যথা শ্বেতসারের মধ্যে তা অনুপস্থিত।

রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে হেগস্টেড ১৯৬৫ সালের ২৩ জুলাই হিকসনের কাছ থেকে পর্যালোচনা করার জন্য গবেষণাপত্রগুলো চাইছেন। হিকসন তার উত্তরে যে গবেষণাপত্রগুলো পাঠাচ্ছেন সেগুলোর বিষয় এমন যে তা চিনির বিক্রি কমাতে পারে—এ থেকে বোঝাই যায় চিনিশিল্প সেই গবেষণাপত্রগুলোর প্রতিকূল সমালোচনাই চাইছিল।

হিকসন হেগস্টেডকে লিখছেন: 'আমাদের মূল উৎসাহ সেইসব পুষ্টি [গবেষণা] নিয়ে যেখানে বলা হচ্ছে শর্করাজাতীয় খাদ্য হয়েও চিনি সেইসব বিপাকীয় সমস্যার জন্ম দেয় যা কিনা এতদিন কেবল চর্বির সঙ্গেই যুক্ত বলে ভাবা হয়েছে। যদি একগাদা মূল্যায়ন আর সাধারণ ব্যাখ্যার তোড়ে সেই কথাটাই ডুবে যায় তাহলে আমি খুবই হতাশ হব।' উত্তরে হেগস্টেড হিকসনকে আশ্বস্ত করছেন, 'আমরা শর্করাজাতীয় খাদ্য নিয়ে আপনার বিশেষ উৎসাহের কথা জানি, সেটা যতদূর সম্ভব আলোচিত হবে।' 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কেন গবেষণা পর্যালোচনা প্রকাশ করার জন্য হেগস্টেডদের অর্থ দিচ্ছিল সেটা স্পষ্ট।

প্রোজেক্টের ন-মাস কেটে যাবার পর হেগস্টেড 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-কে জানাচ্ছেন, চিনিকে হৃদ্‌ধমনির রোগের সঙ্গে জড়িয়ে আরও নতুন প্রমাণ আসছে বলে পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগছে: 'যতবার আইওয়া [গবেষক] দল একটা করে নতুন গবেষণাপত্র প্রকাশ করছেন, সেটা খণ্ডন করতে [পর্যালোচনার অংশ] আমাদের ততবার বদলে লিখতে হচ্ছে।' এই আইওয়া গবেষকদল চিনি খাওয়া আর কোলেস্টেরল বাড়ার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে গবেষণার ফল প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৬৬-র ৬ সেপ্টেম্বর হেগস্টেডকে হিকসন জিজ্ঞেস করেছেন, 'খসড়ার আর এক কপি কি আমি খুব শিগগির পেতে পারি?' তার উত্তরে হেগস্টেড জানান, 'আমি আশা করি এক-দু সপ্তাহের মধ্যেই আপনার কাছে ওটা পৌঁছে যাবে।' এ থেকে মনে হয় সম্পাদনার কাজে হিকসন যুক্ত ছিলেন। যেদিন হিকসন শেষ খসড়াটা পান তার ক-দিন বাদেই সেটা প্রকাশের জন্য জমা দেবার পরিকল্পনা ছিল হেগস্টেডের। জমা দেবার অল্প আগে হেগস্টেডকে হিকসন জানাচ্ছেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে এইরকম একটা জিনিসই আমরা চাইছিলাম, আর এটা প্রকাশিত হবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করব।'

নামি জার্নাল মানে বিজ্ঞানীর স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যম? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রোজেক্ট ২২৬-এর প্রকাশ

প্রজেক্ট ২২৬-এর ফল দুটো অংশে ভাগ হয়ে *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ* ম্যাকগ্যান্ডি, হেগস্টেড, ও স্টেয়ার-এর 'খাদ্যে চর্বি, শর্করাজাতীয় পদার্থ ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসজনিত রোগ' নামে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পর্যালোচনা নিবন্ধের লেখকদের ইন্ডাস্ট্রি ও অন্য অর্থ প্রদানকারীদের নাম উল্লেখ ছিল (যেমন থাকার প্রথা), কিন্তু 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অর্থ প্রদানকারী বা সাহায্যকারী ভূমিকার উল্লেখ ছিল না। এই নিবন্ধে অনেকগুলো প্রমাণ ও সমীক্ষা বা পরীক্ষা বিচার করা হয়েছে, যেগুলোর বিষয় ছিল এই দুটো:

১. আমেরিকান খাদ্যে উপস্থিত উচ্চমাত্রার চিনি হৃদ্‌ধমনির রোগ তৈরি করে কিনা?

২. স্যাচুরেটেড চর্বি আর চিনি—আলাদা করে এদের প্রতিটার পরিমাণ কমিয়ে হৃদ্‌ধমনির রোগ কতটা প্রতিরোধ করা যায়?

নিবন্ধের শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে এ ব্যাপারে 'কোনো সন্দেহ নেই' যে হৃদ্‌ধমনির রোগ প্রতিরোধে যেটুকু খাদ্যাভ্যাস বদলের দরকার তা হল খাদ্যে স্যাচুরেটেড চর্বির বদলে পলি-আনস্যাচুরেটেড চর্বি দেওয়া, আর কোলেস্টেরল খাওয়া কমানো।

আমেরিকান খাদ্যে বেশি চিনি ও হৃদ্‌ধমনির রোগ

এই পর্যালোচনা-নিবন্ধটি চিনি ও হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে জনভিত্তিক (epidemiologic), পরীক্ষাগারের তথ্য (experimental) ও পদ্ধতিগত (mechanistic)—এই তিন ধরনের গবেষণার তথ্যকে বিচার করে বলেছে:

‘সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর অর্থ প্রদানকারী বা সাহায্যকারী ভূমিকার উল্লেখ ছিল না।

১. জনভিত্তিক সমীক্ষা দেখাচ্ছে বেশি চিনি খেলে হৃদ্‌ধমনির রোগ হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

২. পরীক্ষাগারের তথ্য বলছে, সুস্থ মানুষ বেশি চিনি খেলে তাদের রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ে, আর যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি আছে, তাদের তা আরও বাড়ে।

৩. পদ্ধতিগত (mechanistic) গবেষণা দেখাচ্ছে— ক. চিনি আমাদের অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়ার ওপর কাজ করে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে; খ. চিনির এক অংশ হল ফ্রুক্টোজ যা লিভার, চর্বিকোষ ও অন্যান্য অঙ্গে কাজ করে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়াতে পারে।

এরপর ওই গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধটি সমস্ত সমীক্ষা ও পরীক্ষাকে, যথা ইয়ুডকিন-এর কাজ ও আইওয়া গবেষকদলের কাজ, এক এক করে বিচার করেছে। এগুলোকেই ‘সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ মূল্যায়ন নিবন্ধ লেখার আগে ও লেখার কাজ চলাকালীন ‘বিপজ্জনক’ বলেছিল। পর্যালোচনা-নিবন্ধ এগুলোকে ‘ধর্তব্যের মধ্যে নয়’ বলে আখ্যা দেয়, কেননা ওইসব গবেষণার তথ্যগুলো নিয়ে ‘প্রশ্ন আছে’, আর তার ব্যাখ্যাও ভুল।

জনভিত্তিক সমীক্ষাগুলোকে পর্যালোচনা-নিবন্ধ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি, কেননা এতে অনেকগুলো গুলিয়ে দেবার মতো জিনিস (confounding) আছে। পরীক্ষাগারের তথ্যকে পর্যালোচনা-নিবন্ধ বাতিল করেছে, কেননা সেগুলোতে অনেক বেশি চিনি ব্যবহার করা হয়েছে, অতটা চিনি আমেরিকান মানুষ খান না। ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ নিয়ে করা পদ্ধতিগত (mechanistic) গবেষণা খারিজ, কেননা চিনি হল সুক্রোজ (যদিও সুক্রোজের অণু আমাদের শরীরে দ্রুত ভেঙে গিয়ে এক অণু গ্লুকোজ আর এক অণু ফ্রুক্টোজ তৈরি করে)। অন্য জীব নিয়ে করা পরীক্ষা বাতিল, কেননা ইঁদুর বা ওই জাতীয় জীবের চাইতে মানুষ অন্যরকম, আর মানুষরা পরীক্ষাগারের ইঁদুরের মতো অত কম চর্বি কখনোই খায় না।

এসব হয়তো ঠিক কথা হতেও পারে। কিন্তু সমস্যা হল, রোগের জন্য চর্বিকে দায়ী করে যে সব পরীক্ষা বা সমীক্ষা, সেগুলোতে ঠিক একই রকম ‘ঘাটতি’ রয়েছে। কোনো অজানা কারণে পর্যালোচনা-নিবন্ধের লেখকরা সেগুলো নজর করেননি।

হৃদ্‌ধমনির রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস বদলের কার্যকারিতার তুলনা

বিভিন্ন ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’ চিনি বেশি বা কম খেলে রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা কতটা বাড়ে বা কমে, আর সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে ও যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি আছে তাদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি কতটা হয়, অন্যদিকে চর্বি বেশি বা কম খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কতটা বাড়ে বা কমে, এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করছিল। ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’ (RCT) হল কোনো ওষুধ বা জীবনযাত্রার ওপরে কোনো হস্তক্ষেপ কতটা কার্যকর তা মাপার প্রামাণ্য পদ্ধতি। *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এ প্রকাশিত গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধটি অনেকগুলো ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’ -এর তথ্য সারসংকলন করে আলোচনা করে। চিনি খাওয়া বাড়ানোর প্রশ্নে এই পর্যালোচনা-নিবন্ধটি যুক্তি সাজায় যে চর্বি খাবার বদলে চিনি খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড অনেকটা কমে। আবার, যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি আছে তাদের ক্ষেত্রে চিনির বদলে শ্বেতসার খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড অনেকটা কমে। চিনির বদলে সবজি খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল অনেকটা কমে।

এই পর্যালোচনা-নিবন্ধ জানায়, চিনির জায়গায় শ্বেতসার খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সামান্য কমে। চর্বি খাওয়া নিয়ে নিবন্ধটি বলে, খাদ্যে কোলেস্টেরল কমালে ও স্যাচুরেটেড চর্বির বদলে পলি-আনস্যাচুরেটেড চর্বি খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই কমে।

এসব হয়তো ঠিক কথা হতেও পারে। কিন্তু সমস্যা হল, রোগের জন্য চর্বিকে দায়ী করে যে সব পরীক্ষা বা সমীক্ষা, সেগুলোতে ঠিক একই রকম ‘ঘাটতি’ রয়েছে। কোনো অজানা কারণে পর্যালোচনা-নিবন্ধের লেখকরা সেগুলো নজর করেননি।

অনেকগুলো ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’-এর তথ্য বলেছিল যে চিনির বদলে শ্বেতসার খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই কমে—এই পর্যালোচনা-নিবন্ধটি তাদের দাবি খারিজ করে দেয়। নিবন্ধের মত হল, যেসব সমীক্ষা বা পরীক্ষা যাতে রক্তে ‘কোলেস্টেরলের মাত্রা’-কে হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকির মাপ হিসেবে গণ্য করেছে, সেগুলোই কেবল খাদ্যে চর্বি কিংবা চিনির পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর ফলাফলকে তুলনা করতে পারে। অনেকগুলো ট্রায়াল-এর তথ্য বলেছিল যে চিনির বদলে চর্বি বা সবজি খেলে সুস্থ মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই কমে—এই মূল্যায়ন-নিবন্ধটি তাদের দাবিও বাতিল করে দেয়। নিবন্ধের মতে, খাদ্যে এমনতর পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর খাদ্যে চিনির বদলে পরিমার্জিত শ্বেতসার (ও তার সঙ্গে কৃত্রিম মিষ্টস্বাদের রাসায়নিক)—এ পরিবর্তন সম্ভবপর, কিন্তু খাদ্যে কোলেস্টেরল কমালে ও স্যাচুরেটেড চর্বির বদলে পলি-আনস্যাচুরেটেড চর্বি খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ যতটা কমে, এইভাবে ততটা কমতে পারে না।

খাদ্যে চিনির পরিমাণ কমানো নিয়ে ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’-গুলোর সারসংক্ষেপের বিপরীতে, খাদ্যে চর্বির পরিমাণ কমানো নিয়ে ‘র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’-গুলোর সারসংক্ষেপের সময় এই

পর্যালোচনা-নিবন্ধ ট্রায়ালগুলো চালানোর কায়দা, চর্বি কমানোর ফলে উপকারপ্রাপ্তির পরিমাপগত ফল, বা ভুলভ্রান্তি নিয়ে কিছুই বলেনি। অথচ খাদ্যে চর্বির পরিমাণ কমানো নিয়ে এইসব ট্রায়ালগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রকরণগত সমতা ছিল না। এরকম একটিমাত্র 'র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল', হেগস্টেড নিজে যার অন্যতম লেখক, ঠিকঠাকভাবে দেখাচ্ছে যে খাদ্যে কোলেস্টেরল কমালে ও স্যাচুরেটেড চর্বির বদলে পলি-আনস্যাচুরেটেড চর্বি খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেকটা কমে। অন্য সব ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে তাদের 'কন্ট্রোল গ্রুপ' ঠিকমতো নেওয়া হয়নি।

কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ, যেমন চর্বি খাওয়া কমানো, কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে কিনা সেটা বুঝতে গেলে অন্তত দুটো দল নিতে হয়। এক দল নির্দিষ্ট পদক্ষেপটি (এখানে চর্বি খাওয়া কমানো) নেয়, অন্য দলটি সেই কাজটা করে না (অর্থাৎ চর্বি খাবার পরিমাণ একই রাখে)। নির্দিষ্ট সময় পরে দুই দলের মধ্যে তুলনা করে (আগে দুই দলের প্রত্যেকের কোলেস্টেরল কতটা ছিল, আর এক দল চর্বি খাওয়া কমিয়ে দেবার পরে দুই দলের প্রত্যেকের কোলেস্টেরল কতটা হল—সেটা মাপা) বোঝা যায় নির্দিষ্ট পদক্ষেপটি, অর্থাৎ চর্বি খাওয়া কমানো প্রত্যাশিত সুফলদানে (কোলেস্টেরল কমানো) কতটা কার্যকর। যে সব ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কন্ট্রোল গ্রুপ ঠিকমতো নেওয়া হয়নি, তাদের ফল তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু পর্যালোচনা-নিবন্ধ সেইসব ট্রায়ালগুলোর ফল বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। স্মরণীয়, চিনি খাওয়া কমালে উপকার হয়, এমন দেখিয়েছিল যেসব ট্রায়াল, পর্যালোচনা-নিবন্ধ তাদের নির্মমভাবে বাতিল করেছিল।

আবার, জনভিত্তিক (epidemiologic) গবেষণার তথ্য বিচার করার সময়ও একই রকম একচোখোমি দেখিয়েছে এই পর্যালোচনা-নিবন্ধ। চিনি খাবার বিপদ মাপার ক্ষেত্রে এই নিবন্ধ বলেছে, জনভিত্তিক (epidemiologic) গবেষণার তথ্য হৃদ্‌ধমনির রোগের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক নিয়ে তেমন কিছু বলতে পারে না। কিন্তু চর্বি খাবার বিপদ নিয়ে আলোচনার সময় একই নিবন্ধ খাদ্যে কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড চর্বির বিপদ বিষয়ে জনভিত্তিক গবেষণার তথ্য থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গবেষণা পর্যলোচনা-নিবন্ধটি যুক্তি দিয়েছে, খাদ্যে কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড চর্বি দিয়ে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ানোর ব্যাপারটির জীববিদ্যাগত সম্ভাবনা আছে, আর সে ব্যাপারে পদ্ধতিগত (mechanistic) গবেষণার তথ্যের অভাব গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেষে নিবন্ধটি বলেছে, পলি-আনস্যাচুরেটেড চর্বি সহজপ্রাপ্য আর স্যাচুরেটেড চর্বির বদলে আমেরিকান খাদ্যে সহজেই গ্রহণযোগ্য।

সিদ্ধান্ত

'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর এইসব আভ্যন্তরীণ নথি দেখায় যে ফাউন্ডেশন ১৯৬৫ সালে হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল তার বাজার ধরে রাখতে, এবং তার প্রথম প্রোজেক্ট, *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এ ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধ চিনিশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করেনি। এই নিবন্ধ জনভিত্তিক (epidemiologic), পরীক্ষাগারের তথ্য (experimental) ও পদ্ধতিগত (mechanistic)—এই তিন ধরনের গবেষণার তথ্য চিনি খাবার সঙ্গে হৃদ্‌ধমনির রোগের সম্পর্ক বিচারে অপ্রতুল—এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে চিনিশিল্পের সুবিধা করে দিয়েছিল।

অন্যদিকে, এই পর্যালোচনা-নিবন্ধ যুক্তি দেখিয়েছিল যে হৃদ্‌ধমনির রোগ প্রতিরোধে আমেরিকান খাদ্য কীভাবে বদলানো দরকার সে প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র উপায় হল সেই সব 'র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল' যাতে হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকির একমাত্র মাপ হিসেবে রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রাকে ধরা হয়। এইরকম ট্রায়ালে আমেরিকান খাদ্যে বেশি চিনি থাকাকে তুলনায় কম বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু সব ধরনের প্রমাণকে গুরুত্ব দিলে সেরকম মনে হত না।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধটি প্রকাশের পর থেকে আমেরিকার চিনিশিল্প হৃদ্‌ধমনির রোগ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ নিয়ে গবেষণায় অর্থ প্রদান বজায় রাখে 'মূলত এই শিল্পের খুঁটি হিসেবে'। যেমন ১৯৭১ সালে আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেন্টাল রিসার্চ'-এর 'ন্যাশনাল কেরিজ প্রোগ্রাম'-কে চিনিশিল্প প্রভাবিত করে। ফলে চিনি খাওয়া ছাড়া অন্যান্য প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে দাঁতের ক্ষয় আটকানোর চেষ্টা বেশি করা হয়। চিনিশিল্প একটি গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করে, 'মানুষের খাদ্যে চিনি'। ১৯৭৬ সালে যখন আমেরিকার নিয়ামক সংস্থা 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ রিসার্চ অর্গানাইজেশন' চিনির নিরাপত্তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন

> চিনিশিল্পের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে লম্বা ইতিহাস রয়েছে।

চিনিশিল্প অন্য নানা পদ্ধতির সঙ্গে এই নিবন্ধের সাহায্যেও তাকে প্রভাবিত করে। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় চিনিশিল্পের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে লম্বা ইতিহাস রয়েছে। সম্প্রতি চিনি হৃদ্‌ধমনির রোগের সঙ্গে জড়িত এটা প্রকাশ করার বৈজ্ঞানিক চেষ্টার বিরুদ্ধে চিনিশিল্প মহল থেকে কড়া সমালোচনাকে সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বুঝতে হবে।

চিনিশিল্পের প্রভাব বিস্তারের এই ইতিহাস দেখায়, যাঁরা পর্যালোচনা-নিবন্ধ লিখবেন, তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে যেন কোনো প্রশ্ন না থাকে। গবেষক বা নিবন্ধকারের সমস্ত আর্থিক লেনদেনকে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধ নীতিনির্ধারণে, পরবর্তী গবেষণার ধারা স্থির করায় ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর গবেষণাখাতে অর্থব্যয়ের দিক নির্ধারণে বড়ো ভূমিকা রাখে।

যেখানে এই পর্যালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এ ১৯৮৪ সাল থেকে সব লেখকের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন স্বার্থের সংঘাত ঘোষণার নিয়ম করা হয়েছে। যখন চিনিশিল্প হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে গবেষণায় অর্থপ্রদান শুরু করেছিল, সেই সময় থেকে লেখকদের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন স্বার্থের সংঘাত ঘোষণা প্রায় সব জার্নাল ইত্যাদিতে নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান স্বার্থের সংঘাত ঘোষণার নীতি নানা শিল্পের আর্থিক

লাভক্ষতির চাপ সহ্য করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা।

অনেক শিল্পই তাদের নানা জিনিসের ভালোমন্দ বিচারের গবেষণাতে আর্থিক অনুদান দেয়। পুষ্টিবিজ্ঞানে এই ধরনের 'ইন্ডাস্ট্রি স্পনসরশিপ'-কে এখন বেশি করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগে সাধারণ মানুষের যেসব ভেতরকার নথি দেখার উপায় ছিল না, সেগুলো দেখতে পাবার ফলে ইন্ডাস্ট্রির উদ্দেশ্য, দীর্ঘকালীন পদ্ধতি ও তাৎক্ষণিক কৌশল, ও কোম্পানিকে মামলা ও সরকারি নিয়মের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তৈরি তথ্যভাণ্ডার—এসব বিষয়ে জনস্বাস্থ্য গবেষকদের অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেড়েছে। এই অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বজোড়া তামাক-নিয়ন্ত্রণে গবেষণাকে কাজে লাগানোতে খুব কাজের বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার, বর্তমান বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে, চিনিশিল্পের ভেতরকার নথি নিয়ে গবেষণা স্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাছে চিনিশিল্পের চিনির খারাপ প্রভাব নিয়ে তথ্য গোপন রাখার পদ্ধতি ও কৌশল কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

এটা অবশ্য আমেরিকা ইউরোপের কথা। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নৈতিক মান বেশ খারাপ, বহু ওষুধ-ট্রায়ালে অনৈতিক কার্যকলাপ চোখের সামনে আসার পরেও তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই হয়তো বহুজাতিক নানা কোম্পানি ভারতে ওষুধের ট্রায়াল ও অন্যান্য জনভিত্তিক সমীক্ষা ও পরীক্ষা করাতে আসছে। অন্যদিকে, ভারতে ইন্ডাস্ট্রির গোপন নথি পাবার উপায় নেই বললেই চলে। *জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন* যেমনভাবে ওদেশের শক্তিশালী 'সুগার লবি'-র বিরুদ্ধে নিবন্ধ প্রকাশ করে, আমাদের দেশে সেরকম হবার সম্ভাবনা কম, কেননা চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের আর্থিক ও অন্যরকম স্বাধীনতা অনেক কম। তবু হয়তো এদেশেও *জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*-এর এরকম নিবন্ধ কিছু অনুপ্রেরণার সঞ্চার করতে পারে।

আলোচ্য নিবন্ধ নিজের যে সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছে

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত রজার অ্যাডামস-এর নথি ও অন্যান্য নথি একটিমাত্র চিনিশিল্প বিষয়ক ব্যাবসা সংস্থার কাজের খানিক হদিশ দিয়েছে। যে সব নথি জোগাড় করা গেছে সেগুলো 'সুগার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর ১৯৫০-১৯৬০ জুড়ে চলা 'প্রোজেক্ট ২২৬' সম্পর্কে পুরো তথ্য কতটা তা জানিয়েছে, বা কোন তথ্যের গুরুত্ব কতটা সেটা বলেছে—এমন দাবি করা শক্ত। চিনিশিল্প আলোচ্য গবেষণা পর্যালোচনা-নিবন্ধটি লিখে বা পরিবর্তন করে দিয়েছে, এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। আর চিনিশিল্প এর মূল সিদ্ধান্তগুলোকে গড়ে দিয়েছে—এইরকম প্রমাণও সরাসরি নয়, প্রেক্ষিত-নির্ভর (circumstantial)। অন্যান্য সংগঠন, নেতৃস্থানীয় পুষ্টিবিজ্ঞানী, বা খাদ্য ইন্ডাস্ট্রি যারা স্যাচুরেটেড চর্বি আর রক্তের কোলেস্টেরলকে হৃদ্‌ধমনির রোগের মূল খাদ্যগত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে—এদের কারোর ভূমিকাই খতিয়ে দেখা যায়নি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূল অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়নি, কেননা তাঁরা মারা গেছেন।

উপসংহার

আমেরিকার চিনিশিল্প ১৯৬৬ সালে হৃদ্‌ধমনির রোগ নিয়ে প্রথম যে গবেষণা-প্রকল্পকে অর্থ সাহায্য করেছিল, সেটি হৃদ্‌ধমনির রোগের ব্যাপারে চিনির খারাপ ভূমিকার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেখিয়েছিল। ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে ও আমেরিকায় রাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে চিনি নিয়ন্ত্রণে নীতি প্রণয়ন হচ্ছে। তবু হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকি বাড়ানোর ব্যাপারে চিনির কথা সব সময় উল্লেখ করা হচ্ছে না। হৃদ্‌ধমনির রোগে বিশ্বে সব থেকে বেশি মানুষ মারা যান, তাই স্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকি মাপার সমস্ত গবেষণায় যেন খাদ্যে বাইরে থেকে যোগ করা চিনির ব্যাপারটাও মাপেন। নীতিনির্ধারক সংগঠনগুলির খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর অনুদান নেওয়া গবেষণাকে কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত, আর পরীক্ষাগারের তথ্য (experimental) ও পদ্ধতিগত (mechanistic) গবেষণা—এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তার সঙ্গে খাদ্যে মেশানো চিনির দ্বারা মানুষের হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকি নিয়ে যে সব সমীক্ষা ও পরীক্ষা হচ্ছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কোলেস্টেরল-সহ হৃদ্‌ধমনির রোগের ঝুঁকির অন্যান্য সব চিহ্নকে ও রোগের লক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত।

আমাদের দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের আরও বেশি আর্থিক ও অন্য সব স্বাধীনতা দরকার। বিশেষ করে যেন কর্পোরেট স্বার্থ গবেষণায় টাকা ঢেলে বিজ্ঞানকে নিজের মনমতো ও ভুল পথে চালনা করতে না পারে সেটা দেখতে হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research A Historical Analysis of Internal Industry Documents. Cristin F. Kearns, Laura A. Schmidt. Stanton A. Glantz. *JAMA Intern Med*. (Published online) September 2016. ইন্টারনেটে লভ্য http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2548255।

সদ্য-ডাক্তারের প্রলাপ বিলাপ

ডা. অপূর্ব

সবে ডাক্তারি পাশ করেছি, আর দেখছি সবাই কোমর বেঁধে পড়তে বসেছে, এমডি এমএস কিছু একটা লাগাতেই হবে। ভয়ে ভয়ে আমিও বসার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের বুড়োবুড়ো দাদাদিদিদের মুখে একটা কথা শুনতে পাই যে আগে নাকি এমবিবিএস করার পর সব ডাক্তাররা পোস্টগ্র্যাজুয়েশন করত না। বরং প্রায় সকলেই বেশ কয়েকবছর করে হাউসস্টাফশিপ করত বিভিন্ন বিষয়ে। তাতে নাকি সব কিছুই শেখা যেত, যেগুলো আজকের দিনে পিজি (পোস্টগ্র্যাজুয়েশন, অর্থাৎ ওই এমডি এমএস) না করলে শেখা যায় না। মেডিক্যাল পড়ার শেষের দিকে ডাক্তারি করার কথা শিকেয় তুলে যখন অন্য কিছু পড়তে যাওয়ার কথা ভাবতে বসেছিলুম তখনই ইন্টার্নশিপ শুরু হল। দেখলুম, আরে, এ-জিনিসটা তো ঠিক আগের সাড়ে চারখানা বছরের মতন নয়! বেশ আলাদা। বইয়ের জ্ঞান দরকার তো বটেই, কিন্তু ডাক্তারি জিনিসটা যে শুধু বইয়ের জ্ঞান নির্ভর নয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। কথা বলতে শেখা, টেকনিক্যাল কাজের দক্ষতা বাড়ানো, রোগীর দল, যাকে আমরা বলি পেশেন্ট পার্টি, তাদের ম্যানেজ করা, রোগের গুরুত্ব আর পরিস্থিতির গুরুত্ব আলাদা করে মাপতে শেখা—এসব বুঝলুম আস্তে আস্তে। পাশাপাশি ক্লিনিক্যাল এগজামিনেশন, রোগ নির্ণয়—টুকটাক শেখা চলতে লাগল। ওয়ার্ডে কাজটাজ করে দেখলুম পাঁচরকমের লোকের সঙ্গে দিব্যি বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে। রোগী দেখা, মানে রোগীদের সঙ্গে তাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলা, রোগীর পেট বুক হাত আরও কত দ্রষ্টব্য-অদ্রষ্টব্য স্থান পরীক্ষা করা—এসব শেখা চলল। এরই মধ্যে তুই থেকে তুমি থেকে আপনি হিসেবে সম্বোধিত হতে শুরু করেছি। স্যার-ট্যার এসবও শুনতে হচ্ছে মাঝে মাঝে—মন্দ নয়, কী বলেন।

সবকিছুর মাঝেও কিন্তু দেখি ডাক্তারিটা হাতে ধরে শেখাচ্ছে না কেউ। খালি চ্যানেল করো (মানে রোগীর শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশনের সুচ দাও ঢুকিয়ে), রোগীর নাকের মধ্যে দিয়ে রাইলস টিউব পেটে চালান কর, ক্যাথিটার পরাও—ব্যস। এই—এই আমার কাজ, আর কিছু কেউ পড়ায় না, শেখায় না। দাদারা তাও-বা কিছু শেখায়-টেখায়, আরএমও প্রফেসরেরা আলাদা করে ইন্টার্নদের কিছু পড়ান শেখান না। সমস্যাটা হয়তো শুধু তাদের না। অনেকেই সাড়ে চার বছর সময়টা ভালোই পড়াশোনা করে, নিয়মিত ওয়ার্ডে যায়। হয়তো আমারই মুদ্রাদোষে হতেছি একেলা, কে জানে বাবা। সেরকম ভালো ছাত্র তো কলেজে ছিলুম না কোনোদিনই। যেটুকু না হলে নয় সেটুকু পড়াই পড়তুম। এসব সত্ত্বেও অনেকসময়ই কিন্তু আমরা খারাপ ছেলেমেয়েরা দেখতুম, এবং দেখছি, যে ভালো ভালো পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের থেকে ভালোই কাজ করতে পারি। 'ভালো' ছেলে-মেয়েরা অনেকেই ডিউটি ফাঁকি মারে, পিজির কোচিং পড়তে যায় টাকা দিয়ে ডিউটি কিনে। ইন্টার্নশিপে টাকা দিয়ে ডিউটি কেনার কথা শুনে বৃদ্ধ সিনিয়রগণ চক্ষু চড়কগাছ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের ওপর কৃপাই হয় আমাদের, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানেন তাঁরা? জেন-এক্স জেন-ওয়াই জেন-জেড-এর প্রোডাক্টগণ তাঁদের এক হাটে কিনে অন্য ওয়েলেক্সে বেচে দিতে পারি। সে যাক, ছেঁদো কথা, টাকা দিয়ে কত কিছু কেনা যায়, বেড়ালের জন্য কিডনি ও কুকুরের জন্য ডায়ালিসিস, আর এ তো মাত্র চার-আট ঘণ্টার ডিউটি, তাও ফাঁকিবাজি করলে বিশেষ কেউ বলার নেই।

কিন্তু সমস্যা হ্যাজেস, দাদাগো, কিঞ্চিৎ সমস্যা হ্যাজ। ইন্টার্নশিপ করার পর আমাদের সকলেরই সাধারণ রোগব্যাধির চিকিৎসা শিখে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা কতজন গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার সেটা পারি? আমরা অনেকেই চাইও না ইন্টার্নশিপে কিছু শিখতে। কী হবে সময় নষ্ট করে, বরং কয়েকটা এমসিকিউ করলে কাজ দেবে। এমসিকিউ জানেন না? তবে তো আপনার জীবন বৃথা। ওই যে, একলাইনের প্রশ্নের টিক মারা উত্তর। টিক ঠিক তো এমডি-এমএস, টিক ভুল তো একবছর, নিদেন ছ-মাস, বইয়ের গাড্ডায় ডুব দাও গো মন হরি বলে।

আমাদের কলেজে অনেক দাদাদিদিরা পিজি পড়তে এসে বলত এবং বলেও, তারা নাকি ইন্টার্নশিপে কোনোদিন চ্যানেল করেনি, স্টিচ দেয়নি। আমার ইউনিটের এক সার্জারির(!) দাদা পিজি পাওয়ার আগে কোনোদিন 'ছুঁচ-সুতো' হাতেই নেয়নি। বছর কুড়ি আগে ইন্টার্নশিপে মোটামুটি সব কিছুরই বেসিক ম্যানেজমেন্ট শেখা যেত, খালি মেডিসিন না। হাউসস্টাফশিপে সবাই ওয়ার্ড সামলাত, রাউন্ড দিত, অপারেশন করত, আউটডোরে বসত। এখন হয় না। সে সময় অনেক ডাক্তার জেনারেল ফিজিশিয়ান হয়েই জীবন কাটাতেন, খুব খারাপ ডাক্তারি করতেন না তাঁরা। আমার ছোটোবেলার ছোট্ট শহরটাতে পিজি পাশ করা ডাক্তার ছিলেন হাতে গোনা। তাতে খুব খারাপ ছিল চিকিৎসার অবস্থা এমনও না। কিন্তু এখন জেনারেল ফিজিশিয়ান হওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না কেউ। সত্যিই আমরা ইন্টার্নশিপে, হাউসস্টাফশিপে এখন বলতে গেলে কিছুই শিখি না। আমাদের যদি এমবিবিএস-এর পর জনগণের সেবার্থে সমাজে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা সেরেফ অকূল দরিয়ায় আল্লা কূল নাই রে গাইব। স্পেশালাইজেশনের এত রমরমা, পিজি করার এত গুরুত্ব, তাই আজ হাউসস্টাফশিপে কিছু শেখা যায় না। আবার হাউসস্টাফশিপে তো কিছুই শেখা যায় না তাই পিজি না করে উপায় কী? অদ্ভুত গোলকধাঁধা এক!

ব্রিটেনে শুনি ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস ব্যবস্থায় যেকোনো রোগীকে আগে স্থানীয় জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখাতে হয়। কাকে দেখাতে হবে সেটাও আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া থাকে। উনি মোটামুটি কী চিকিৎসা করতে পারেন সেটাও স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনে ঠিক করে দেওয়া আছে। কাজেই বিশাল কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। উনিই প্রয়োজনমতো স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে রেফার করেন। নিজের ইচ্ছামতো জেনারেল ফিজিশিয়ানকে টপকে স্পেশালিস্টকে দেখানোর কোনো উপায় নেই। অনেক টাকা থাকলেও না। কেননা ওখানকার ডাক্তারবাবুরা রোগীর কাছ থেকে কোনো টাকাই নেন না। ডাক্তারদের বেতন দেয় সরকার। এর ফলে ধনী গরিব সমান চিকিৎসা পায়, টাকার সঙ্গে চিকিৎসার গুণমানের সমানুপাতিক সম্পর্কটা থাকে না। আমাদের দেশে

ভালো জেনারেল ফিজিশিয়ান খুব কম। সবাই প্রথমেই নিজের মনমতো স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে দৌড়োন। এদিকে কার্ডিয়োলজিস্ট ডাক্তার হার্ট দিব্যি চেনেন একেবারে আণবিক লেভেলে, কিন্তু কিডনির হয়তো 'ক'-এর খবর রাখেন না, বা রাখলেও কোনো রিস্ক না নিয়ে সোজা রেফার করে দেন ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্টের কাছে। মেডিসিনের ডাক্তার সার্জারির ছায়া মাড়ান না, সার্জারির ডাক্তার গাইনির। ফলে যেটা হয় রোগীর সামগ্রিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা হওয়ার সুযোগ হয় না কখনো। রোগীর রোগের সামগ্রিক চিকিৎসার বদলে একটুখানি অংশের চিকিৎসা হয় মাত্র, তবে সেটা যে 'হাইলি স্পেশালাইজড' আধুনিক চিকিৎসা তাতে সন্দেহ নেই। তবে দুর্জনে বলে, এতে রোগীরা অনেক দিন ধরে অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখিয়েও চিকিৎসার সুফল পান না। তা দুর্জনের কথায় কান দিলে পেটের অন্ন জোগাড় হবে না, সুতরাং রোগী বাঁচুক বা না বাঁচুক, ভারি কেতার চিকিৎসা যেন না আটকায়।

বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে বই কী। ব্রিটেনে ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস NHS এও স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা একটা জরুরি অংশে, কিন্তু আমাদের মতো কথায় কথায় স্পেশালিস্টের চেম্বারে দৌড়োনো নিতান্তই উজবুকের লক্ষণ। আজকাল সেটাই হয়। এর ফলে যেটা হয় আমরা ডাক্তাররা গ্র্যাজুয়েশন করি পোস্টগ্র্যাজুয়েশন করার জন্য। এটা হল সত্যি কথা। কিন্তু এটা বলা খুব নিরাপদ নয়। কর্পোরেট হাসপাতাল এখন স্পেশালিস্ট ডাক্তারির হদ্দমুদ্দো করে ছাড়ছে, জেনারেল ফিজিশিয়ান তথা জিপি-র কাছে দৌড়োনো যে আঠেরো আনা উজবুকি, সেটা হয়তো তারা উকিল লাগিয়ে প্রমাণ করে দেবে। কিন্তু মুশকিল হল, ঘরের কোণে পাড়ার মধ্যে আপনাকে দেখার কেউ রইল না। বা রইল ওষুধ দোকানের স্মার্ট সেলসম্যান, পাশ-না-করা ডাক্তার, এবং চণ্ডীমণ্ডপের নানা আধুনিক সংস্করণ থেকে না-চেয়ে পাওয়া পরামর্শ।

আধুনিক ডাক্তারি জ্ঞান চর্চিত, আবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয় প্রতিষ্ঠান, 'institution'-এর গেটের ভেতর। ভাবতে ইচ্ছা হয়—দুচ্ছাই আর কলেজ হাসপাতাল না এবার অন্য কোথাও অন্য কোনোভাবে শেখার চেষ্টা করব। শিখব সেগুলো যেগুলো আসলে দরকার। পেটের ভেতরে সেলাই মারার ক্যাটগাট পাতন পদ্ধতিতে তৈরি হয়, না বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে, তা না জানলেও চলবে। টিবি, ডায়াবিটিসের ম্যানেজমেন্ট না জানলে চলবে না। কিন্তু এখানে এসেও ঠেকে যাই। মেডিসিন তাও না হয় কিছুটা হল, গাইনি ও ধাত্রীবিদ্যা? সাইকায়াট্রি? স্কিন? চক্ষুরোগ? শেখার জন্যে টিচার চাই, অজস্র পেশেন্ট চাই, তাদের সঙ্গে বেহিসেব সময় কাটানো চাই . . . সেসব ইনস্টিটিউশনের বাইরে আমি কোথায়ই-বা পাই? কাজেই শেষমেশ পিজি করা ছাড়া গতিও নাই।

এর মাঝেও কি কেউ চেষ্টা করছে না। করছে তো বটেই। পিজি না করেও যে অনেক কিছুই অনেক অনেক ভালো শেখা যায় তার প্রমাণ একেবারেই নেই তা তো নয়। তবে সেটা হল গিয়ে চোদ্দহাজারে একটা। সেটা আজকের ট্রেন্ডের কাছে 'অ-সাধারণ'। 'সাধারণত' আজকাল সবাই পিজিই করবে, অন্তত দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বছরের বছর চেষ্টা করবে। যারা পাবে না তারা হবে 'কনফিউজড কোয়াক'—যারা নিজেরাই জানবে না কখন তারা বৈজ্ঞানিক ডাক্তারির পাশের এঁদো খালে পড়ে ডুবেই গেছে। তবে একটা সরকারি চাকরি পেলে ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে বসে সে হয়তো বাজে হাতের লেখায় ডাক্তারি জ্ঞানের গুস্টির পিন্ডি চটকানো রেফার লিখবে পাইকারি রেটে। আরে সব জনগণ কি আর ভালো ডাক্তারির যোগ্য, নাকি কদর বোঝে? অতিরিক্ত মাত্রায় বিশেষ হতে গিয়ে আমরা সাধারণ হতে ভুলেই যাই। তাতে রোগীকে আর পুরোটা দেখতে পাই না, অর্জুনের মতো পাখির চোখটাই খালি নজরে আসে, আর সব ঝাপসা হয়ে যায়। এমনটা যেন না হয়। এমনটা যেন না করি। কিন্তু কী যে করব জানি না।

বি.দ্র. লেখাটা নিঃসন্দেহে একপেশে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ চোখের মাত্র এক দুই বছরের অভিজ্ঞতা পুরো ছবিটাকে তুলে ধরতে পারেই না। তাও যদ্দিন পুরোটা দেখতে পাব না তদ্দিন যা দেখতে পাচ্ছি তাই লিখব না কেন? এই ভেবেই লেখা।

ইয়ে, টিভি-র টক শো-র কায়দায় জানিয়ে দিই, মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, ইন্টার্নশিপ শেষ করেছেন; শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২ ৯৮৩০৮৪৭১৫৯

চিঠি

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঁচ বছর—পাঠকের চোখে

মাননীয় সম্পাদক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে
মহাশয়,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হওয়া এই পত্রিকার সম্বন্ধে কিছু মতামত নিবেদন করছি।

১. প্রতি বছর ছয়টি করে পাঁচ বছরে ৩০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার দাম একই, ২০ টাকা প্রতি সংখ্যা। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে পত্রিকার দাম একই থাকাটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

২. আমাদের দেশে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা খুবই কম। সেই অভাব পূরণ করতে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জেনারেল লেকচার থিয়েটার হলে এই পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়েছিল জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত দুই চিকিৎসক ডা. জ্ঞানব্রত শীল ও ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের হাতে। একই অনুষ্ঠানে ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্তের পিতা ডা. পার্থসারথী গুপ্ত স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রেখেছিলেন আশীষ লাহিড়ী ও ড. কল্যাণ রুদ্র। প্রথম প্রকাশিত সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ২০১১) সম্পাদকীয়তে উল্লেখ ছিল 'আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সাধারণ কাঠামো ও জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সৎভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার এবং সেটা সম্ভবও। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* আমাদের পথ চলা শুরু হল।' এই পত্রিকা কিন্তু এই আদর্শকে মাথায় রেখেই প্রতিটি সংখ্যায় তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

এই পত্রিকা কিন্তু এই আদর্শকে মাথায় রেখেই প্রতিটি সংখ্যায় তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

৩. পত্রিকার প্রথম বছরে (২০১১-২০১২) মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও তার মেয়াদ ছিল ১৩ মাস। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল যথাক্রমে সেপ্টেম্বর ২০১১ ও ডিসেম্বর ২০১১। এরপর ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২ এইভাবে প্রতি দু-মাস অন্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

৪. পত্রিকার প্রথম পাঁচটি সংখ্যায় পাতার সংখ্যা বিভিন্ন হলেও (প্রথম-৪০, দ্বিতীয়-৪৪, তৃতীয়-৫৬, চতুর্থ-৫২, পঞ্চম-৫৬), ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ ছিল। আবার চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ হয়েছে। যা ৩০-তম সংখ্যা অবধি একই আছে।

৫. চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে প্রচ্ছদে পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা (২৪ তম) প্রকাশ করার রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। পত্রিকা সংগ্রাহকদের কাছে ক্রম অনুসারে পত্রিকা রাখতে সুবিধা হয়। আশাকরি এই প্রথা আগামী দিনের সংখ্যাগুলিতেও (৩১-থেকে) থাকবে।

৬. পত্রিকার প্রকাশকের ঠিকানা—৫০/এ কলেজ রোড, হাওড়া ছিল প্রথম সংখ্যা থেকে পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত (২৫-তম) এরপর ২৬-তম সংখ্যা থেকে প্রকাশকের ঠিকানা বাউরিয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া হয়েছে।

৭. চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শেষ প্রচ্ছদে উল্লেখ থাকছে Registration No. Applied for।

৮. পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা বিভাগে ১৩জন চিকিৎসকের নাম ছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই দু-জন চিকিৎসকের নাম বাদ পড়ে (ডা. জ্যোর্তিময় সমাজদার ও ডা. প্রদীপ সাহা) সংখ্যাটি ১১ জন হয়। এরপর আবার চতুর্থ সংখ্যায় এই বিভাগে ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্তের নাম বাদ হয়ে ১০ জন চিকিৎসকের নাম নথিভুক্ত হয়। সেই থেকে এই তালিকা অপরিবর্তিত আছে।

৯. প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত (দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা বাদে) পত্রিকার চতুর্থ প্রচ্ছদের নীচের দিকে পত্রিকার প্রকাশক, মুদ্রক, সম্পাদক ও দাম উল্লেখ করা হত। যেহেতু পত্রিকার প্রথম পাতায় এই বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে তাই বোধহয় এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এড়াতেই চতুর্থ প্রচ্ছদ থেকে এই বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১০. তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার প্রচ্ছদে 'স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী' উল্লেখ করা শুরু হয়। পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে এই ঘোষণার পরিবর্তন হয়ে হয়েছে 'চিকিৎসা-স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমাজ'। অবাক হতে হয় যে, এখানে 'বিজ্ঞান' বিষয়টা বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও পত্রিকার প্রথম পাতায় পত্রিকার নামের ঠিক নীচেই লেখা থাকে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী।

১১. প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদে আবেদন ছিল—স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে সমস্ত মানুষকে সচেতন করবার উদ্দেশে আপনার লেখা পাঠান ও মতামত জানান। এই আবেদন দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই বাদ পড়ে যায়। আবার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন'—এই আবেদন প্রকাশ হতে থাকে। যদিও চতুর্থ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় এই আবেদন অনুপস্থিত।

১২. মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন—এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় এক নতুন বিভাগ চালু হয়। নাম—'সন্দীপ্তাকে মনে রেখে'। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এই বিভাগের একই শিরোনাম ছিল। তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় এই বিভাগের নতুন নামকরণ হয়—'সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন'। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকার পর চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় সন্দীপ্তার ছবি দিয়ে এই বিভাগের পরিচিতির পাতাটি অনুপস্থিত। আবার চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে পুরো পাতার সন্দীপ্তার ছবি। তবে শিরোনামে শুধুই 'সন্দীপ্তাকে মনে রেখে' চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা থেকে আবার প্রথম দিকের মতন। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন শিরোনামে এই বিভাগ। কিন্তু চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় আবার বিভ্রাট। সন্দীপ্তার ছবির পাতা নেই। তবে এবারের শিরোনামে শুধুই

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের ভুবন। (স্বাস্থ্য ভুবন নয়)। চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় আবার পুরানো ছন্দে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম আর দ্বিতীয় সংখ্যায় আবার সন্দীপ্তার ছবিসহ তাঁকে নিয়ে অনেকটাই লেখা। পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় সন্দীপ্তার সঙ্গে যুক্ত করা হল কুসুমবাই। বিভাগের শিরোনাম হল—কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে। এই রীতি মেনে চলা হয়েছে সর্বশেষ প্রকাশিত সংখ্যা (৩০-তম) পর্যন্ত। এই বিভাগটি যখন নিয়মিত রাখাই হচ্ছে তখন একটা নির্দিষ্ট শিরোনাম থাকাই বাঞ্ছনীয়।

১৩. যেকোনো পত্রিকায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত পাঠকের মতামতকে। এই পত্রিকার ৩০টি সংখ্যায় এখনও পর্যন্ত মোট ২৬টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা পিছু একের কম। এটি ইতিবাচক লক্ষণ নয়। বিভিন্ন সংখ্যা মিলিয়ে প্রথম বছরে ১০টি চিঠি, দ্বিতীয় বছরে ৭টি চিঠি, তৃতীয় বছরে ৭টি চিঠি, চতুর্থ বছরে ৩টি চিঠি এবং পঞ্চম বছরে মাত্র ১টি চিঠি ছাপা হয়েছে। পাঠকদের মতামত আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি এবং তৎসহ পাঠকদের চিঠিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

১৪. পত্রিকায় কুইজ ও শব্দছক রাখা হচ্ছে। তবে এই বিষয়গুলির উত্তর অন্তত পরের সংখ্যায় থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করলে এই বিষয়ে পাঠকদের আগ্রহ বাড়বে নিঃসন্দেহে।

১৫. স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সমাজ বিষয়ে লেখা বই সমালোচনার জন্য আহ্বান করলে ভালো হয়। নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা এই পত্রিকার মান বাড়াতে সাহায্য করবে।

পরিশেষে জানাই যে, পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অত্যন্ত উচ্চমানের। বিভিন্ন রোগ ও তার উপশমের বিষয়ে চিকিৎসকবৃন্দের তথ্য নির্ভর লেখা এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ।

সারা বছর বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস (চিকিৎসা-রোগ সংক্রান্ত) পালিত হয়। এই সব দিনগুলোর তাৎপর্য বর্ণনা করে এই সব বিষয়ে রচনা থাকলে ভালো হয়।

আর একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাই। সেটি হল প্রশ্ন-উত্তর। পাঠকদের প্রশ্ন আহ্বান করে তার যথাযথ উত্তর প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নিশ্চয় বাড়বে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার একজন পাঠক হিসাবে এই পত্রিকার প্রকাশিত ৩০টি সংখ্যার এক সালতামামি নিবেদন করলাম।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

ধন্যবাদান্তে—

বিনীত
সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী
১সেপ্টেম্বর, ২০১৬
১১এ/২ ডা. পি.এন.মুখার্জী স্ট্রিট
চাতরা, শ্রীরামপুর-৭১২২০৪
ফোন-৯৪৩৩০২৫৭৯৫ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

শব্দছক-১

প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার

১	❖	❖	❖	২		৩				৪	❖
	❖	❖	৫		❖		❖	❖	❖	৬	
৭	৮	৯	❖		❖	১০				❖	❖
১১					❖		❖	❖	❖	❖	❖
	❖		❖	❖	❖		❖	❖	১২	❖	১৩
❖	❖	❖	১৪	❖	❖	১৫		১৬		❖	
❖	❖	১৭					❖		❖	❖	
১৮	❖		❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖	
১৯			❖	❖	❖	❖	২০	❖	❖	২১	
	❖	২২						❖	❖	❖	
❖	❖		❖	❖	❖	❖		❖	২৩	❖	
২৪						❖	❖	২৫			

সূত্র:

পাশাপাশি: ২. এই পরীক্ষা রোগীকে প্রায়ই করাতে হয়। ৫. জীব ৬. বাচ্চাদের দাঁতের ক্ষতি করে। ৭. চোখের অসুখ। ১০. চামড়ার শুষ্কতা দূর করে। ১১. জন্ডিস হলে এটা পরীক্ষা করা হয়। ১৫. মানসিক এই জটিলতা এক গ্রিক রাজার নামে। ১৭. এক ধরনের মানসিক রোগী ১৯. এক অসুখের নাম। ২১. রোগকে চিনতে এটাও পরীক্ষা করা হয়। ২২. অনিদ্রা রোগ। ২৪. ওষুধের খারাপ দিক। ২৫. এক ধরনের জ্বর।

উপরনীচ: ১. এটা কমে গেলে আয়রন খেতে হয়। ৩. লিপিড প্রোফাইলে এর দেখা পাবেন ৪. ব্যায়াম করলে থাকতে পারবেন। ৮. প্রস্রাব-সংক্রমণের ডাক্তারি পরিভাষা। ৯. মশা দেখলেই—। ১২. যতক্ষণ এটা আছে। ততক্ষণ আশা ছাড়তে নেই। ১৬. কবজি টিপে ডাক্তাররা এটা দেখেন। ১৮. উকুন হলে, চুলের সঙ্গে এটাও পরিষ্কার রাখুন। ২০. হাতুড়ে ২৩. অক্সিজেনের অভাব হলেও উঠতে পারে।

সমাধান ২৫ পাতায়

প্রতিবেদন

বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করেছে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখতে আপনাদের সহায়তা চাই

আশা করি *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠক-পাঠিকারা খেয়াল করেছেন যে, জুন-জুলাই, ২০১৬, ২৯-তম সংখ্যা থেকে আমরা পত্রিকায় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ছাড়া আর কারোর বিজ্ঞাপন ছাপছি না। স্বাস্থ্যের বৃত্ত সোসাইটি ওষুধ কোম্পানি ইত্যাদি থেকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০১৫-র সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায়। কিছু ওষুধ কোম্পানিকে বিজ্ঞাপন ছাপানোর কথা আগেই দেওয়া হয়েছিল, তা শেষ না হওয়া অবধি বিজ্ঞাপন ছাপতে হয়।

পত্রিকা পাঠানো আমাদের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, যদিও গ্রাহকরা আমাদের পত্রিকার মহামূল্যবান সম্পদ।

প্রথম তিন বছরে আয়ের সর্বাধিক ১.৫% এসেছে দান থেকে। শেষ বছরে ১৮% আয় দান থেকে। সোসাইটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা এবং কিছু বন্ধুর এই দান।

বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে সহযোগী সংগঠন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বিজ্ঞাপন চালু থাকবে, তা হল সংখ্যা পিছু ৮ হাজার টাকা, অর্থাৎ বছরে

বিজ্ঞাপন কেন আমরা নিতাম আর বিজ্ঞাপন না নিয়ে কেমন করে চলছে পত্রিকা বোঝাতে সোসাইটির গত চার বছরের হিসেব উদ্ধৃত করছি।

বছর	মোট খরচ	মোট আয়	ঘাটতি/ বাড়তি	– বিজ্ঞাপন	– %	পত্রিকা বিক্রি	– %	গ্রাহক চাঁদা	– %	দান	– %
২০১২-১৩	২৮১৮২৬	৩১০০৫৮	২৮২৩২	১৫৪৫০০	০.৪৯৮২৯৩৮৬৮	১২১১১৭	০.৩৯০৬২৯১৫	২৮২৪০	০.০৯১০৭৯৭৩৩	৪৭০০	০.০১৫১৫৮৪৫৪
২০১৩-১৪	৩৩৪৭৯৫	৩১৪১৬৮	–২০৬২৭	১৩৯৬৮০	০.৪৪৪৬০২৮৮৮	১২৯৪৯৩	০.৪১২১৭৭৫৬১	৪২১৭০	০.১৩৪২২৭৫৪৭	১০০০	০.০০৩১৮৩০১
২০১৪-১৫	৩৮৬৩৩৭	৩৯৭১৩০	১০৭৯৩	১৯৯৮৪০	০.৫০৩২১০৫৩৬	১৫১০৯০	০.৩৮০৪৫৪৭৬৩	৪০৩৯০	০.১০১৭০৪৭৩১	৪০০০	০.০১০০৭২২৬৯
২০০৫-১৬	৪৪৯৩৮৩	৪৬১১৪৭	১১৭৬৪	১৫৯৮৮০	০.৩৪৬৭০০৭২৭	১৬২৯৯৮	০.৩৫৩৪৬২১২৮	৫১৫৫০	০.১১১৭৮৬৪৮	৮৩৮৫০	০.১৮১৮২৯২২১

দেখা যাচ্ছে প্রথম তিন বছরে পত্রিকার আয়ের ৪৪% থেকে ৫০% আয় আসত বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপন নেওয়া নিয়ে আমাদের মনে দ্বিধা ছিল; যদিও আমরা কোনো বেআইনি বিজ্ঞাপন ছাপতাম না, ওষুধের ব্র্যান্ড নামের কোনো বিজ্ঞাপন কখনো ছাপিনি আমরা। কিন্তু এটাও সত্যি যে দু-জন সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য অধিকাংশ ওষুধ-কোম্পানির বিজ্ঞাপন জোগাড় করতেন, তাঁদের ওষুধ-কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিত তাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে কোম্পানির ওষুধ লেখেন বলে। বিজ্ঞাপন নেওয়ার জন্য আমাদের কিছু বন্ধুর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি বারবার। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারা যায়নি।

পত্রিকা বিক্রি থেকে গত চার বছরে আয়ের ৩৫% থেকে বেড়ে ৪১% হয়েছে। গত বছর আমরা হিসেব করেছিলাম মোটামুটি ৬০০০ পত্রিকা ছেপে বিক্রি করতে পারলে পত্রিকা স্বনির্ভর হতে পারবে। গত বছর আমাদের প্রতি সংখ্যার প্রিন্ট অর্ডার ছিল ২৭০০, এ বছর বেড়ে হয়েছে ৩০০০। এই গতিতে বেড়ে ৬০০০ হতে সময় লাগবে বেশ ক-বছর।

আয়ের ৯% থেকে ১৩% এসেছে গ্রাহক-চাঁদা থেকে। এখানে বলা দরকার পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন এখনও অবধি না হওয়ার কারণে গ্রাহকদের ৪৮ হাজার টাকা। গত আর্থিক বছরে অন্য কোনো বিজ্ঞাপন না থাকলে ঘাটতি পড়ত প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার টাকা।

এই ঘাটতি আগামী আর্থিক বর্ষে পূরণ করতে আরও বন্ধুর সহায়তা চাই।

যদি মনে করেন, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, তাহলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল, ডা. সুমিত দাশ, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

সাহায্য পাঠান হাতে হাতে, অথবা NEFT করুন/চেক পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto, A/c No.0315101025024, Canara Bank, Princep Street Branch, IFSC Code CNRB0000315.

NEFT করলে বা চেক পাঠালে, রসিদ-এর জন্য ফোন/SMS করুন প্রকাশক গোপাল সরকারকে—৯৮৩০৮ ৮৬৪৪১। স্বাস্থ্যের বৃত্তে